لا اله الا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

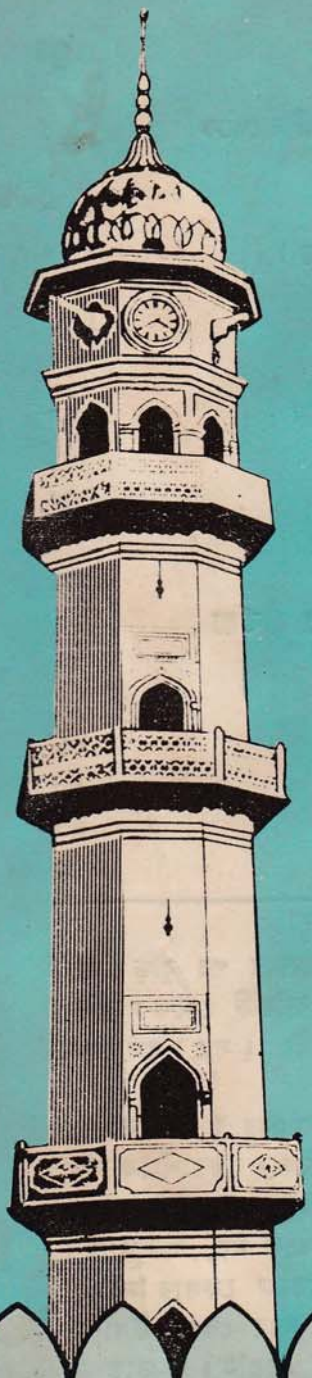

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৬তম বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা

২২ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৫ হিঃ ॥ ১৬ই ভাদ্র, ১৪০১ বঙ্গাব্দ ॥ ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৪র্থ সংখ্যা (৫৬তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ৪

অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ ১০

কবিতা ঃ কৌলুল মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ চৌধুরী আবদুল মতিন ৩০

তুচ্ছ থেকে উচ্চে উঠার ডাক

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ৩১

তাহরীকে ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব ও আমাদের কর্তব্য

জনাব তাসাদ্দক হোসেন ৩৫

ছোটদের পাতা

পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৬

সংবাদ ৪০

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৪১

সম্পাদকীয় ঃ ৪৩

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

"আমাকে দাও, তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেই।" পৌঁছে দেয়ার পর বুড়ি বল্ল, "বাবা, তুমি খুবই ভাল মানুষ। সাবধান থাকবে মুহাম্মদ নামক ব্যক্তিটি থেকে। কারণ ঐ মুহাম্মদ আমাদের বাপ দাদার ধর্ম নষ্ট করে ফেলছে।" মহানবী (সাঃ) বল্‌লেন, "ভয় নেই, আমিই সেই মুহাম্মদ।"

মক্কা বিজয়ের পর তিনি হেন্দাকে ক্ষমা করলেন, যে হেন্দা হামজার (রাঃ) কলিজা চর্বন করেছিল। সাহাবীদের নাক, কান কেটে গলায় মালা পরেছিল। ওয়াশীকে ক্ষমা করলেন, যে তাঁর প্রিয় চাচাকে হত্যা করেছিল। তাঁর (সাঃ) কন্যা জয়নাবের ঘাতক হাব্বারকেও ক্ষমা করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এহেন ঘটনা শুধু বিরল নয়, অভূতপূর্ব।

বলা হয়, ইসলামের নবী (সাঃ) কোরেশদের উপাস্য মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। এ সম্বন্ধে সবাই জানে যে, যখন পৃথিবীতে এদের আর কোন উপাসক ছিল না। এই মূর্তিগুলোর একজন উপাসক থাকতেও সেগুলি ভাঙ্গা হয়নি। তাছাড়া শুধু অদ্ভুত আকৃতির অসুন্দর মূর্তিগুলিই ভাঙ্গা হয়নি। নষ্ট করে ফেলা হয়েছে মহানবীর (সাঃ) পূর্ব-পুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধের ইব্রাহীমের (আঃ) ছবিও। কারণ এগুলি ছিল কল্পিত। শিল্প মানে এর কোন মূল্য ছিল না। (নির্বাহী সম্পাদক)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৬তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৪ : ৩১শে যুল্হজ্জ, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ১৬ই ভাদ্র, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান-৩

৮০। কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই ইহা সমীচীন (৪৩২) নহে যে, আল্লাহ্ তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়ত দান করেন, অতঃপর সে লোকদিগকে বলে, 'আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে ইহাও বলিবে) তোমরা রব্বানী (প্রভুর ইবাদতকারী) (৪৩২-ক) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন (৪৩২-খ) করিয়া থাক।'

৮১। এবং ইহাও (তাহার জন্য সমীচীন) নহে যে, সে তোমাদিগকে এইরূপ আদেশ দিবে যে, তোমরা ফিরিশ্‌তাগণকে এবং নবীগণকে প্রভুরূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি সে তোমাদিগকে কাফের হইবার আদেশ দিবে? রুকূ ৮

৪৩২। 'মা কানা লাহু' শব্দমালাটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে : এই কাজ করা তাহার শোভা পায় না ; (২) ইহা বা এইরূপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয় বা যুক্তিতে আসে না যে, সে ইহা করিয়াছে ; (৩) সে ইহা বা এইরূপ করিতে (দৈহিক বা মানসিক-ভাবে) অক্ষম।

৪৩২-ক। 'রাব্বানীয়ীন', 'রাব্বানী' শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ হইল : (১) যিনি ধর্ম কাজে নিয়োজিত থাকেন কিংবা ধর্মীয় সাধনায় নিমগ্ন থাকেন ; (২) আল্লাহ্ সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে ; (৩) যিনি ধর্মজ্ঞানে পাণ্ডিত্য রাখেন ; ভাল ও ধার্মিক লোক ; (৪) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম ধাপগুলি শিক্ষা দিয়া মানুষকে উচ্চধাপের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন ; (৫) প্রভু বা নেতা ; (৬) সংস্কারক (লেইন, সিবাউয়াই এবং মুবাররাদ)।

৪৩২-খ। 'কেননা, তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করিয়া থাক' বাক্যটি এই উপদেশ দিতেছে যে, যাহারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের উচিত অন্যান্যদেরকেও তাহা শিখাইয়া দেওয়া, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত না থাকে।

৮২। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অঙ্গীকার (৪৩৩) লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'কিতাব এবং হিকমত হইতে যাহাকিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন (৪৩৩-ক) করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, এবং এই বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের (৪৩৩-খ) অন্তর্ভুক্ত রহিলাম'।

৪৩৩। 'মীসাকুন্নাবীঈন' (নবীগণ হইতে গৃহীত অঙ্গীকার) দ্বারা, আল্লাহ্‌র সাথে নবীগণের চুক্তি বা অঙ্গীকারকে বুঝায় অথবা নবীগণের মাধ্যমে তাহাদের উম্মত হইতে গৃহীত চুক্তি বা অঙ্গীকারকে বুঝায়। এইস্থলে শব্দগুলি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ 'মিসাকুন্নাবীঈন' স্থলে অন্য একটি পঠন যাহা উবাই বিন কাব এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ দ্বারা সমর্থিত, তাহা হইল 'মীসাকাল্লাযীনা উতুল কিতাব' যাহার অর্থ হইল, তাহাদের অঙ্গীকার, যাহাদিগকে গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছিল (মুহীত)। এই অর্থই পরবর্তী বাক্যটি দ্বারা সমর্থিত হয়; যথা—অতঃপর, তোমাদের কাছে যাহা (যে গ্রন্থ) আছে, তাহার সমর্থন লাভ করিয়া যদি কোনও নবী আসেন—পূর্ববর্তী নবীর উম্মতের কাছেই পরবর্তী নবী আসেন বা আসিয়াছিলেন।

৪৩৩-ক। এখানে 'মুসাদ্দিক' শব্দটি, সত্যনবী হইতে মিথ্যা দাবীকারকের পার্থক্য নিরূপণের চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মুসাদ্দিক' শব্দটির অনুবাদ করা হইয়াছে, 'যে বাণীর সত্যায়ন করে' এবং এখানে ইহাই সঠিক অর্থ। কেননা, পূর্বে অবতীর্ণ ধর্ম-গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ নবাগত নবীর জীবনে পূর্ণ হইতে থাকে এবং ইহা দ্বারাই তাহার দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

৪৩৩-খ। এই আয়াতটি যদিও অন্যান্য নবীগণের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তথাপি ইহা রসূলে পাক (সাঃ)-এর উপর বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উভয় প্রয়োগই শুদ্ধ। আয়াতটি একটি সাধারণ নিয়ম বাতলাইয়া দিয়াছে। প্রত্যেক নবীর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী নবী তাহার শিষ্যগণকে এই শিক্ষা দিয়া যান যে, পরবর্তী সময়ে যে নবী আসিবেন তাহাকে যেন তাহারা অবশ্য-অবশ্য গ্রহণ করে ও মানিয়া লয়। যদি একটি মাত্র জাতির ধর্ম-পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া কোন নবী আসেন, যেমন ঈসা ও অন্যান্য ইসরাঈলী নবী (আঃ) আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে কেবলমাত্র ঐ জাতির জন্য তাহাকে মানিয়া লওয়া ও সাহায্য করা বাধ্যকর। কিন্তু সকল জাতির সকল ধর্মগ্রন্থ যদি একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যেমনটা মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে করা হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই নবীকে গ্রহণ করা ও সাহায্য করা সকল জাতির জন্যই বাধ্যকর। আঁ-হযরত (সাঃ) কেবলমাত্র ইসরাঈলের নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন, (যিশাইয়-২১:১৩-১৫, দ্বিতীয়-১৮:১৮; ৩৩:২; যোহন-১৪:২৫, ২৬; ১৬:৭-১৩) তাহাই নহে, বরং আর্য-মুনিদের, বৌদ্ধ ও যরথুস্ত্রী ধর্মনেতাদের বহু ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহারই (সাঃ) আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হইয়াছে (শাফ্‌রাং দাসাতির, পৃঃ ১৮৮, শিরাজী প্রেস, দিল্লী জামস্‌পি, প্রকাশক নিজামুল মুশায়েখ, দিল্লী ১৩৩০ হিজরী)।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

কুরআন ঃ

طهرا بيتى للطائفين (البقرة ١٢٦)

অর্থাৎ আমার ঘর (কা'বা শরীফ) তওয়াফকারীদের জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো।
(আল-বাকারা—১২৬)

হাদীস ঃ

إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجواد فنظفوا اراه قال افنيتكم ولا تشبهوا اليهود - (ترمذى)

অর্থাৎ—আল্লাহ্ পবিত্র। পবিত্রতাকে তিনি পসন্দ করেন। তিনি ত্রুটিমুক্ত ও পরিচ্ছন্নতাকে পসন্দ করেন। তিনি মর্যাদাবান ও সম্মানিত, দানকারী ও দান করাকে পসন্দ করেন। সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, উঠোন পরিষ্কার রাখো এবং ইহুদীদের অনুকরণ করোনা। (ইহুদীরা চাষাবাদ করত এজন্যে তাদের ঘরের উঠোনে গোবর ও আবর্জনা থাকতো।) (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা—আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) আমাদিগকে নিজের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বহু পরিবার এমন রয়েছে যারা অপরিচ্ছন্ন ও ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে পরিবেশকে দূষিত করে। তারা তাদের নিজেদের ও পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থাকে।

মুসলমানদের জন্যে তো খোদার রসূল (সাঃ) এই বলেছেন যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আঁ-হুযুর (সাঃ) সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি (সাঃ) অত্যন্ত পরিষ্কার থাকতেন। যদিও তাঁর (সাঃ) কাপড়ে তালি দেয়া থাকতো তথাপি তা উজ্জল ও পরিষ্কার থাকতো, তাঁর (সাঃ) হুজরাও অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। আজকের এ যুগে পরিষ্কার থাকার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত হবার পরেও অনেকেই অপরিচ্ছন্ন ও অপরিষ্কার থাকে। বিছানা, ঘর-বাড়ী, বাড়ীর উঠোন, কাপড়-চোপড়, বাসন ও আসবাবপত্র সব পরিষ্কার রাখার দরকার। দেখা যায় যে, স্বচ্ছল ও ধনী পরিবারের ঘর দুয়ারও অপরিচ্ছন্ন থাকে। বস্তুতঃ যেভাবে হৃদয়ের পবিত্রতা খোদাকে পাবার জন্য অতীব জরুরী তেমনি দৈহিক পবিত্রতাও ঈমানের জন্য অপরিহার্য, অর্থাৎ আত্মার দৈহিক ও বাহ্যিক পবিত্রতা খোদা প্রাপ্তির জন্য আবশ্যকীয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন।

کوئی اس پاک سے جو دل لگا دے
کرے پاک اپ کو تب اس کو پاوے

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তাহলে নিজেকে আগে পবিত্র করতে হবে তবেই তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই যেন নিজেদেরকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিষ্কার করতে পারি। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

(২য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

কুরআন শরীফের পূর্বে আরবের লোকেরা আল্লাহ্ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করিত ইহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাদের এই বিষয়টির অনুসরণ করা উচিত যে, খোদাতা'লা কুরআন শরীফে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহ্' শব্দটিকে এই অর্থসহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নবী-রসূল ও কেতাবসমূহের প্রেরণকারী, যমীন ও আকাশের স্রষ্টা অমুক অমুক গুণে গুণান্বিত এবং তিনি অদ্বিতীয়। হাঁ, যাহাদের নিকট খোদাতা'লার কালাম পৌঁছে নাই এবং এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী জবাবদিহী করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কখনো সম্ভব নহে যে, তাহারা এই পদ-মর্যাদা লাভ করিবে যাহা রসূলে করীমের (সাঃ) জ্যোতির অনুবর্তিতার দ্বারা লোকেরা লাভ করিবে। কেননা রেসালতের জ্যোতির অনুবর্তিতার দরুন অনুবর্তিতা-কারীরা যে মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে কেবল অন্ধরা ঐ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। ইহা খোদার ফযল, যাহার উপর চাহেন করেন।*

অতঃপর এই যুলুমটির প্রতি লক্ষ্য কর যে, কুরআন শরীফের শত শত আয়াত উচ্চস্বরে বলিতেছে, কেবল তওহীদ নাজাতের কারণ হইতে পারে না, বরং এতদ্‌সঙ্গে রসূলে করীমের (সাঃ) উপর ঈমান আনার শর্ত আছে; এতদ্‌সত্ত্বেও মিয়া আবদুল হাকিম খান এই সকল আয়াতের কোন পরোয়াই করে না এবং ইহুদীদের ন্যায় যে দুই একটি আয়াত সংক্ষি-প্তাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে উহাদের বিপরীত অর্থ করিয়া বার বার উপস্থাপন করে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, এই সকল আয়াতের যদি এই অর্থই হয় যাহা আবদুল হাকিম উপস্থাপন করে তাহা হইলে ইসলাম পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে সকল আদেশ যথা নামায, রোযা,

---

* টিকা: যদি এই সংক্ষিপ্ত আয়াতের এই অর্থ করা হয় তবে কি কারণে এই অন্য সংক্ষিপ্ত আয়াত অর্থাৎ ان الله يغفر الذنوب جميعا (সূরা আল্‌ যুমার—আয়াত ৫৪, অর্থ:—নিশ্চয় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন—অনুবাদক) এর আলোকে বিশ্বাস রাখা যাইবে না যে, শেরেকও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

ইত্যাদি শিখাইয়াছেন ইহাদের সব কিছুই অর্থহীন ও খামাখা সাব্যস্ত হয়। কেননা যদি ইহাই হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত তওহীদ দ্বারা নাজাত লাভ করিতে পারিবে তবে নবীকে অস্বীকার করিলে কোন পাপই হইবে না এবং ধর্মত্যাগ করিলে কাহারো কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে কুরআন শরীফে এমন কোন আয়াত নাই যাহা নবী করীমের অনুবর্তিতার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হইতে বলে। ধরিয়া লওয়া হউক যদি ঐ দুই তিনটি আয়াত এই শত শত আয়াতের বিরোধী হয় তবুও অল্প সংখ্যক আয়াতকে অধিক সংখ্যক আয়াতের অধীন করা উচিত ছিল। অধিক সংখ্যক আয়াতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ধর্মত্যাগের পোষাক পরিধান করা উচিত নহে। এস্থলে আল্লাহ্‌র কালামের আয়াতে কোন স্ববিরোধিতাই নাই, কেবল রহিয়াছে স্বীয় প্রজ্ঞার পার্থক্য এবং নিজ প্রকৃতির অন্ধকারাচ্ছন্নতা। 'আল্লাহ্' শব্দটির ঐ অর্থ করা আমাদের উচিত, যাহা খোদাতা'লা নিজেই করিয়াছেন, নিজের পক্ষ হইতে ইহুদীদের ন্যায় অন্য অর্থ বানানো উচিত নহে।

এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লার কালাম এবং তাঁহার রসূলগণের আদি হইতে এই নিয়ম যে, প্রত্যেক উদ্ধত ও কঠোর অস্বীকারকারীকে এই ভঙ্গিতেও হেদায়াত করা হয় যে, তোমরা সঠিকভাবে ও নিষ্ঠার সহিত খোদার উপর ঈমান আন, তাঁহাকে ভালবাস এবং তাঁহাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর। তাহা হইলে তোমরা নাজাত লাভ করিবে। এই কালামের (কথার) অর্থ এই যে, যদি তাহারা পুরাপুরিভাবে খোদার উপর ঈমান আনে তবে খোদা তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করার তওফিক দান করিবেন। এই সকল লোক কুরআন শরীফ পড়ে না। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, খোদার উপর খাঁটি ঈমান আনা তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনার জন্য কারণ হইয়া যায় এবং এইরূপ লোকদের বক্ষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। এই জন্য আমারও রীতি ইহাই যে, যখন কোন আর্য বা ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান বা ইহুদী বা শিখ বা অন্য কোন ইসলাম অস্বীকারকারী কূটতর্ক করে এবং কোন ভাবেই বিরত হয় না তখন আমি পরিশেষে বলিয়া দিই যে, তোমাদের এই তর্ক দ্বারা তোমরা কিছুতেই উপকৃত হইবে না। তোমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত খোদার উপর ঈমান আন। ইহাতে তিনি তোমাদিগকে নাজাত দিবেন। কিন্তু আমার এই কথার অর্থ এই নহে যে, নবী করীমের অনুবর্তিতা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাইতে পারে। বরং এই কথার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ সততার সহিত খোদার উপর ঈমান আনিবে খোদা তাহাকে তওফিক দান করিবেন এবং স্বীয় রসূলের উপর ঈমান আনার জন্য তাহার বক্ষকে খুলিয়া দিবেন। অনুরূপভাবে আমি অভিজ্ঞতার আলোকে দেখিয়াছি যে, একটি নেকী (পুণ্য কাজ) অন্য নেকীর তওফিক দান করে এবং একটি নেক আমল অন্য নেক আমলের শক্তি দান করে। তাযকেরাতুল আউলিয়ায় এক অদ্ভুত কাহিনী লিখিত আছে যে, এক আল্লাহ্‌ওয়ালা

বুযুর্গ বলেন: একবার এইরূপ ব্যাপার হইল যে, কয়েকদিন ধরিয়া অনেক বৃষ্টিপাত হইল। বৃষ্টিপাত বন্ধ হওয়ার পর আমি কোন এক কাজে আমার বাড়ীর ছাদে উঠিলাম। আমার প্রতিবেশী ছিল এক বৃদ্ধ। সে অগ্নি উপাসক ছিল। সে ঐ সময় নিজ বাড়ীর ছাদে অনেক শস্যবীজ ছড়াইতে ছিল। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল যে, কয়েক দিন হইতে বৃষ্টির দরুন পাখীরা ক্ষুধার্ত। ইহাদের প্রতি আমার দয়া হইয়াছে। এই জন্য আমি ইহাদের জন্য শস্য বীজ ছড়াইতেছি যাহাতে আমার পুণ্য হয়। আমি উত্তর দিলাম, হে বৃদ্ধ! তোমার এই ধারণা ভুল। তুমি মোশরেক এবং মোশরেকদের কোন পুণ্য হয় না। কেননা তুমি অগ্নি উপাসক। এই কথা বলিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। কিছু দিন পর আমার হজ্জ করার সুযোগ ঘটিল এবং আমি মক্কা মোয়ায্যমায় পৌঁছিলাম। যখন আমি তওয়াফ করিতে ছিলাম তখন আমার পিছন হইতে একজন তওয়াফকারী আমার নাম লইয়া ডাক দিল। যখন আমি পিছনের দিকে তাকাইলাম তখন ঐ বৃদ্ধকে দেখিলাম, যে মুসলমান হইয়া তওয়াফ করিতেছিল। সে আমাকে বলিল, পাখীদের জন্য আমি যে শস্য বীজ ছড়াইয়া ছিলাম উহার জন্য কি আমি পুণ্য অর্জন করি নাই? অতএব সে ক্ষেত্রে পাখীদের জন্য শস্য বীজ ছড়ানোর কাজটি এক ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে টানিয়া আনে সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি খাঁটি বাদশাহ সর্বশক্তিমান খোদার উপর ঈমান আনে সে কি ইসলাম হইতে বঞ্চিত থাকিবে? কখনো নহে।

عاشق کہ شد کہ یار بجانش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست

(অর্থঃ—কে সে প্রেমিক যে প্রেমময় বন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না (তাকে চিনতেও পারে না)? হে খাজা! ব্যথাই নাই, চিকিৎসক আছেই চিরবর্তমান—অনুবাদক)।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ নবী করীমের অনুবর্তিতা ছাড়া পরিপূর্ণরূপে তওহীদ অর্জন করা যায় না। এখনই আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, নবুওয়তের ওহীর আয়না ছাড়া খোদাতা'লার গুণাবলী, যাহা তাঁহার সত্তা হইতে পৃথক হইতে পারে না, নিরীক্ষণ করা যায় না। এই সকল গুণকে নিরীক্ষণের রঙে প্রদর্শনকারী কেবল নবীই হইয়া থাকেন। অসম্ভব হইলেও ধরিয়া নেওয়া যাক, নবী ছাড়া খোদার গুণাবলী ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় অর্জন করা যায়। এইরূপ অবস্থায় ইহা শেরেকের পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা এই পঙ্কিল সম্পদকে গ্রহণ করিয়া ইসলামে প্রবেশ না করান। কেননা রসূলের মাধ্যমে খোদাতা'লার নিকট হইতে মানুষ যাহা কিছু পায় তাহা এক আসমানী পানি। ইহাতে মানুষের গর্ব ও আত্মশ্লাঘার কোন স্থান নাই। কিন্তু মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টায় যাহা কিছু অর্জন করে ইহাতে নিশ্চয় শেরেকের কোন পঙ্কিলতা সৃষ্টি হইয়া যায়। অতএব এই প্রজ্ঞার দরুনই তওহীদ শিখানোর জন্য রসূল পাঠানো হইয়াছে এবং মানুষকে কেবল বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই যাহাতে খাঁটি তওহীদ থাকে এবং মানবীয় আত্মশ্লাঘার

শেরেক ইহাতে মিশ্রিত না হইয়া যায়। এই কারণেই বিপথগামী দার্শনিকেরা খাঁটি তওহীদ লাভের সৌভাগ্য পায় নাই। কেননা তাহারা অহংকার, গর্ব ও আত্মশ্লাঘায় বন্দী। খাঁটি তওহীদ অস্তিত্বের অস্বীকারের দাবী জানায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অন্তঃকরণে ইহা না বুঝে যে, আমার প্রচেষ্টার কোন স্থান নাই, বরং ইহা কেবল আল্লাহ্‌তা'লার পুরস্কার ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ অনস্তিত্ব লাভ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি সারা রাত্রি জাগিয়া এবং নিজেকে কষ্টে নিপতিত করিয়া নিজের জমিতে পানি সিঞ্চন করিতেছে এবং অন্য ব্যক্তি সারা রাত্রি শুইয়া রহিল এবং বৃষ্টি নামার দরুন তাহার জমি পানিতে ভরিয়া গেল। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি ইহারা দুইজনেই কি খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমান হইবে? কখনো নহে। বরং ঐ ব্যক্তি অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে যাহার জমি তাহার পরিশ্রম ছাড়াই পানিতে ভরিয়া গেল। এই জন্য খোদার কালামে বার বার ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ঐ খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যিনি রসূল প্রেরণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তওহীদ শিখাইয়াছেন।

প্রশ্ন (৯)

যাহারা সৎ উদ্দেশ্যে আঁ-হযরতের (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিল বা করে, আঁ-হযরতের (সাঃ) রেসালতের অস্বীকারকারী, কিন্তু তাহারা খোদার একত্বে বিশ্বাসী, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকে তাহাদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করা উচিত?

উত্তর ঃ—মানুষের সৎউদ্দেশ্য সন্দেহমুক্ত হওয়ার পর প্রমাণিত হয়। অতএব যেক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে সন্দেহমুক্ততা লাভ করা যায় না, সেক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যের কি প্রমাণ হইল? উদাহরণস্বরূপ, খৃষ্টানদের অবস্থা এই যে, তাহারা প্রকাশ্যে একজন মানুষকে খোদা বানাইতেছে এবং এইরূপ মানুষকে খোদা বানাইতেছে যে, বিপদাবলীতে পতিত হয়। * আর্য সমাজীরা নিজেদের পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন যুক্তি-

---

* টিকা: কোন বিবেক বা জ্যোতির্ময় হৃদয় কি এই কথা গ্রহণ করিতে পারে যে, একজন দুর্বল মানুষ যিনি অতীতের নবীগণের চাইতে এক কণাও বেশী কাজ দেখাইতে পারেন নাই, হীন ও নীচ ইহুদীদের হাতে মার খাইতে ছিলেন, তিনিই খোদা এবং তিনিই যমীন ও আকাশের স্রষ্টা এবং অপরাধীদের শাস্তিদাতা? কোন বিবেক কি এই কথা গ্রহণ করিতে পারে যে, নিজের অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান খোদা অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন? আমি বুঝিতে পারি না, ঈসার সহিত খোদা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় পরিত্রাণের জন্য সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে থাকেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যেক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যে তিন খোদাই ছিলেন সেক্ষেত্রে ঐ চতুর্থ খোদা কে ছিলেন যাহার দরবারে তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা রাত্রি দোয়া করেন? তদুপরি ঐ দোয়া গৃহীতও

(টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

প্রমাণ উপস্থাপন করে না। কেননা তাহাদের দৃষ্টিতে তিনি স্রষ্টা নহেন যাহাতে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্রষ্টাকে সনাক্ত করা যায়। তাহাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী খোদাতা'লা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন না, না বৈদিক যুগে প্রদর্শন করিয়াছেন যাহাতে অলৌকিক ক্রিয়ার মাধ্যমে পরমেশ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের নিকট এই প্রমাণও নাই যে, পরমেশ্বরের প্রতি অদৃশ্যের জ্ঞান, শুনা, বলা, মহিমা দেখানো এবং দয়ালু হওয়া, ইত্যাদি যে সকল গুণ আরোপ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল গুণ তাহার মধ্যে আছে। অতএব তাহাদের পরমেশ্বর কেবল কল্পিত পরমেশ্বর। খৃষ্টানদের অবস্থা ইহাই। তাহাদের খোদার ইলহামের উপরও মোহর লাগিয়া গিয়াছে। অতএব এইরূপ পরমেশ্বর বা খোদার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কীভাবে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়? যে ব্যক্তি স্বীয় খোদার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে না, সে কীভাবে পরিপূর্ণরূপে খোদাকে ভালবাসিতে পারে এবং কীভাবে শেরেকমুক্ত হইতে পারে? খোদা স্বীয় রসূল নবী করীমের (সা:) 'হুজ্জত' (দলিল-প্রমাণের সাহায্যে সত্যতার প্রমাণ) পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি রাখেন নাই। তিনি এক সূর্যের ন্যায় আগমন করেন এবং সবদিক হইতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। অতএব, যে ব্যক্তি এই প্রকৃত সূর্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় তাহার কল্যাণ নাই। আমি তাহাকে সৎ উদ্দেশ্যের অধিকারী বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী এবং কুষ্ঠ যাহার অঙ্গ প্রত্যংগ খাইয়া ফেলিয়াছে সে কি বলিতে পারে যে, আমি কুষ্ঠ রোগী নই এবং আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই? যদি সে এইরূপ বলে আমরা কি তাহাকে সৎ উদ্দেশ্যের অধিকারী বলিতে পারি? এতদ্ব্যতীত যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, পৃথিবীতে এইরূপ ব্যক্তি আছে, যে সম্পূর্ণ সৎউদ্দেশ্য এবং এইরূপ পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেরূপ প্রচেষ্টা সে পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করে, ইসলামের সত্যতা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই তবে তাহার হিসাব খোদার নিকট আছে। কিন্তু আমি আমার সারা জীবনে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই। * এইজন্য আমি এই বিষয়টিকে নিশ্চিতরূপে অসম্ভব

হইল না। এইরূপ খোদার উপর কীরূপে ভরসা করা যাইতে পারে যাহার উপর নীচ ইহুদীরা জয়লাভ করিয়া এবং ক্রুশে না চড়ানো পর্যন্ত তাহার পশ্চাৎ ত্যাগ করিল না? আর্যদেরতো যেন কোন খোদাই নাই, যদিও তিনি অনাদি বটে। এই শিক্ষা কি মানুষকে কোনভাবে সন্দেহমুক্ত করিতে পারে? কিন্তু ইসলাম ঐ খোদা পেশ করিতেছে যাহার সম্পর্কে মানবীয় প্রকৃতি ও সকল নবী একমত যে, তিনি ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণকারীদের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করেন।

* টিকা: ইসলাম মানব-প্রকৃতি অনুযায়ী এইরূপ একটি ধর্ম যে, এক জাহেল ও নির্বোধ হিন্দুও দুই মিনিটে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারে। কেননা অন্যান্য জাতি ইসলামের মোকাবেলায় যে সকল বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে ঐ গুলি লজ্জাজনক ও হাস্যাস্পদ।

বলিয়া জানি যে, কোন ব্যক্তি বিবেক ও ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিকোণ হইতে অন্য ধর্মকে ইসলামের উপর প্রাধান্য দিতে পারে। নির্বোধ ও জাহেল ব্যক্তিরা অবাধ্য আত্মার (নফ্‌সে আম্মারার) শিক্ষার দরুন একটি কথা শিখিয়া নেয় যে, কেবল তওহীদ যথেষ্ট এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নবীগণই তওহীদের জননী হইয়া থাকেন, যাঁহাদের দ্বারা তওহীদের জন্ম হইয়া থাকে। তাঁহাদের দ্বারাই খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। খোদাতা'লার চাইতে 'এতেমামে হুজ্জত' (পূর্ণ যুক্তি ও দলিলের সাহায্যে সত্যতার প্রমাণ) আর কে অধিক জানিতে পারে? তিনি স্বীয় নবী করীমের (সাঃ) সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যমীন ও আকাশকে নিদর্শনাবলী দ্বার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এখন এই যুগেও খোদা এই অধম সেবককে প্রেরণ করিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লামের সত্যায়ণের জন্য হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। এইগুলি বৃষ্টিধারার ন্যায় পতিত হইতেছে। অতএব 'এতেমামে হুজ্জতে' আর কোন্ ঘাটতি বাকী রহিল? যে ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করার বুদ্ধি আছে সে কেন ঐক্য ও বন্ধুত্বের পথের কথা ভাবিতে পারে না? যে রাত্রিতে দেখিতে পারে সে কেন প্রকাশ্য দিবালোকে দেখিতে পায় না? অথচ অস্বীকার করার পথের চাইতে সত্যায়ণের পথ অনেক সহজ। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য এবং যাহার মধ্যে মানবীয় শক্তির পরিমাণ কম তাহার বিচারের ভার খোদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তাহার সম্পর্কে আমি বলিতে পারি না। সে ঐ সকল মানুষের ন্যায় যাহারা বাল্য কালে ও শৈশবে মারা যায়। কিন্তু এক খল অস্বীকারকারী এই বাহানা পেশ করিতে পারে না যে, আমি সৎউদ্দেশ্যে অস্বীকার করি। দেখা উচিত তওহীদ ও রেসালতের বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য তাহার ইন্দ্রিয় সক্ষম কি না। যদি জানা যায় যে, সে অনুধাবন করিতে পারে, কিন্তু দুষ্টামী করিয়া অস্বীকার করে, তবে কীভাবে সে অক্ষম থাকিতে পারে? অনুরূপভাবে যে সকল লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে কূটতর্ক করে এবং ইসলামের যুক্তি-প্রমাণকে খণ্ডন করিতে পারে না, আমরা ধারণা করিতে পারি যে, তাহারা অক্ষম? ইসলাম তো একটি জীবন্ত ধর্ম। যে ব্যক্তি জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে সে কেন ইসলাম ত্যাগ করে এবং মৃত ধর্ম গ্রহণ করে? *

(ক্রমশঃ) (হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

---

* টিকা: যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে একজন মানুষকে খোদা বানায় বা বিনা প্রমাণে খোদাকে স্রষ্টারূপে অস্বীকার করে, সে কী ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ বুঝিতে পারে না?

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৯শে জুলাই '৯৪ ইং, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল-মুনাফিকুন-এর ১ম রুকূ তেলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন :

রিসালতের অবমাননার নামে মুসলিম বলে আখ্যাত কোন কোন দেশে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শাস্তি বিধানের কার্যকলাপ এবং নিজেদের সংবিধানে যথারীতি দফা (অনুচ্ছেদ) রূপে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা প্রয়াস চলছে। এ প্রসঙ্গে আমি ধারাবাহিকভাবে খোৎবা দিতে শুরু করেছিলাম এবং জামা'তকে জানিয়েছিলাম যে, এই বিষয়বস্তু সুদীর্ঘ বিধায় এক-দুই-তিন খোৎবায়ও এর সংকুলান সম্ভব নয়, সেহেতু আমি আগামী বার্ষিক জলসায় জুমুআর খোৎবাতে এর কিছু অংশ বলবার চেষ্টা করবো। তারপর অবশিষ্টাংশ জলসার উদ্বোধনী ভাষণে বর্ণনা করবো।

আজ আমি যে আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেছি এগুলোর সাথে আলোচ্য বিষয়ের গভীর সম্পর্কে রয়েছে। সময়ের স্বল্পতা বিধায় বিস্তারিত আলোকপাত সুযোগ-সাপেক্ষে পরে অন্য সময় করা হবে। তবে এখন আয়াতসমূহের সরল অর্থ (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ) আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্তা'লা বলছেন, "যখন মুনাফিকরা (কপটরা) (হে মুহাম্মদ-সাঃ!) তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করে বলে যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র রসূল। কিন্তু যদিও আল্লাহ্ জানেন যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র রসূল তথাপি তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, এই মুনাফিকরা (তোমার রিসালতের সাক্ষ্য প্রদানে) নিশ্চয় মিথ্যেবাদী। তারা সাক্ষ্য এই দিচ্ছে যে, তুমি আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা অবগত যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র রসূল—তা সত্ত্বেও তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই মুনাফিকরা যা বলছে তা মিথ্যা বলছে। "ইত্তাখায্ আইমানাহুম জুন্নাতান"—বস্তুতঃ এরা এদের কসমকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করছে, যাতে এই বাহানায় (তারা তোমাদের) ভিতরে প্রবেশ ক'রে আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করতে পারে। "ইন্নাহুম সায়া মা কানূ ইয়া'-মালূন'—নিশ্চয় যা তারা করছে তা অতীব মন্দ।

"যালিকা বি-আন্নাহুম আমানু সুম্মা কাফারূ"—এরা ওরকম মুনাফিক ছিল না যারা সূচনাকাল থেকেই কপটতাগ্রস্থ হয়ে থাকে, বরং ঐ সকল মুনাফিকদের প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে,

যারা ঈমান এনেছিল, এবং ঈমান আনার পর তারা কুফরী করেছে। "আমানূ সুম্মা কাফারূ"—তারা কেবল মুনাফিকই নয়, বরং মুরতাদও বটে। এটা হচ্ছে আয়াতের অতি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং কেবল একটি বিষয়ের সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর স্পষ্ট আলোকপাত করছে, যে বিষয়টি কি না মুসলিম দেশগুলোর বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়ে আছে অর্থাৎ মুর্তাদের কি শাস্তি। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা এ আয়াতগুলোতে ঐ উভয় বিষয়কেই একত্রে বেঁধে দিয়েছেন এইরূপে যে, এ ধরনের মুনাফিকদের উল্লেখ করা হয়েছে যারা নিঃসন্দেহে ঈমান এনেছিল এবং নিঃসন্দেহে পরে তারা কাফের হয়ে যায় অর্থাৎ ঈমান আনার পর মুর্তাদ হয়ে যায়।

"ফা তুবিয়া আলা কুলুবিহিম"—এবং ব্যাধি এতো দূর বেড়ে যায় যে, তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়। এখন তাদের পুনরায় ঈমান আনয়নের আর কোন প্রশ্নই থেকে যায় নি। কাজেই কারও যদি এরূপ ধারণা জন্মায় যে, তাদের আবার ঈমান আনার সম্ভাবনা ছিল সেজন্য তাদের সাথে নরম ব্যবহার করা হয়েছে—এ আয়াত ওরূপ ধারণার চিরতরে অপনোদন করে। এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যাদের পক্ষে পুনরায় ঈমান আনয়নের কোন প্রশ্নই উঠে না। খোদা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।

"ফাহুম লাইফ্‌কাহূন"—তারা এমন চরম অবস্থায় (সীমায়) পৌঁছে গেছে যে, তাদের চিন্তা-ভাবনা করার ও সত্যকে বুঝবার শক্তি রহিত ও বিকল হয়ে পড়েছে। তারা (হঠকারিতা ও বিদ্বেষবশতঃ) বুঝালেও আর বুঝতে পারে না। "ওয়া ইযা রায়াইতাহুম তু'জিবুকা আজসামুহুম"—তারা চেনা জানা লোক—এদের দেহাকৃতি, সাজ-সজ্জা ও ঠাঁট-বাট দেখে চোখে ধরে, পসন্দনীয় ঠেকে। এস্থলে 'তু'জিবুকা'-বাক্যাংশে 'তুমি' বলতে হুযুরে আকরাম (সাঃ) যদিও দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান হন, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) তো বাহ্যিক কোনও ঠাঁট-বাট দেখে প্রভাবান্বিত হবার মত ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, সেজন্যে রসূলের সুবাদে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়। কাজেই এস্থলে বুঝানো হয়েছে এই যে, হে শ্রবণকারী ও হে দৃষ্টিপাতকারী! যখন তুমি এই লোকদের দিকে তাকাও, তখন তাদের বাহ্যিক ঠাঁট-বাট ও অঙ্গভঙ্গী এবং চলা-ফেরার রং-ঢং তোমাকে মুগ্ধ করে। "ইঁইয়াকূলূ-তাসমা' লিকাওলিহিম"—তারা এমন বানোয়াট ভঙ্গীতে ইনিয়ে-বিনিয়ে ও বাকপটুতার সাথে কথা-বার্তা বলে যে, তাতে তুমি আগ্রহান্বিত হয়ে থাক। তাদের কথাবার্তা তোমার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয়। কান পেতে তুমি তাদের কথা শ্রবণ করে থাক।

"কায়ান্নাহুম খুশুবুম্ মুসান্নাদাতুন ইয়াহ্‌সাবূনা কুল্লা সাইহাতিন আলাইহিম"—কিন্তু ভেতর থেকে তারা এমনই ভীত-শাঙ্কত, যেমন মুনাফিকরা কাপুরুষ হয়ে থাকে। তারা যেন এলানো সাজানো কাষ্ঠ-খণ্ড। যেমন শুকনো কাঠ ঠেঁস দিয়ে হেলান থাকে, সেগুলোকে সামান্য আগুন দেখালেই ভস্মীভূত হয়, সে আগুন আকাশ থেকে পতিত হোক বা মাটি থেকেই উত্থিত হোক,

তেমনি এ লোকগুলো নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ করে না। কাষ্ঠ-খণ্ডগুলো যখন হেলানো ও সাজানো থাকে, সেগুলোকে খুব সুন্দর দেখা যায়। ইউরোপে বিশেষতঃ শীতকালের জন্যে কাঠগুলোকে যখন সাজিয়ে রাখা হয়—নরওয়েতে যেমন রাখা হয়, তখন সেগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। কিন্তু আকাশ থেকে এক ঝলক বিজলী পতিত হওয়ার সাথে সাথে বা এক কাঠি দিয়াশেলাই দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে ওগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বাহ্যতঃ এদেরকে বেশ সাজানো-গোছানো অবস্থায়, নিজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত বলে দেখা যায় কিন্তু ভিতর থেকে তারা এতো দুর্বল ও শংকাগ্রস্থ যে, তারা জানে, সামান্য বিপৎপাতও তাদের পক্ষে মারাত্মক বলে সাব্যস্ত হবে।

"হুমুল আদুওউ ফাহ্‌যারুহুম"—এরাই হচ্ছে শত্রু, সুতরাং এদের সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নিজেদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। যদি জানাই না থাকে যে, এরা কারা, তাহলে কাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ? এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে কারও নাম উচ্চারণ ব্যতিরেকে যে, যাদের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সময় জানা-শোনা মুনাফিক ছিল।

"কাতালাহুমুল্লাহু আন্না ইউফাকুন"—তাদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হোক! আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুন! (সত্য পথ হতে) তাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?! কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, হত্যা করার আদেশ মানুষকে এখানে কোথাও দেয়া হয় নি। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র লা'নত তাদের উপর পতিত হোক। কিন্তু কোথাও ইশারা ইঙ্গিতেও বলা হয় নি যে, হে মুসলমানরা! তোমাদের অধিকার বর্তায় তাদেরকে হত্যা করার। (বরং এরপর বলা হয়েছে:)

"ওয়া ইযা কিলা লাহুম তায়ালাও ইয়াসতাগফির লাকুম রাসূলুল্লাহে লাউওয়াও রউসাহুম ওয়া রায়াইতাহুম ইয়াসুদ্দূনা ওয়া হুম মুসতাকবিরূন—"—এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়,—এবং তুমি তাদের দেখবে যে, তারা (ঘৃণা ভরে) পিছনে সরে যাচ্ছে এমতাবস্থায় যে, তারা অহংকারের স্ফীত। এতো স্পষ্ট এদের পরিচয় যে, হুযূর (সাঃ)-এর সময় উক্ত আয়াতসমূহ নাযেল হবার পূর্ব থেকে সাহাবারা তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে বলতেন, 'তোমরা তৌবা কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) তোমাদের জন্যে ইস্তেগফার করবেন। তিনি তো মূর্তিমান করুণা। কাজেই এই সুযোগটিকে হাত ছাড়া হতে দিও না। তৌবা করে ফেল, যাতে তোমাদের খোদার রসূলের ইস্তেগফার লাভের সৌভাগ্য ঘটে। (এসকল উপদেশ শুনে) তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখ যে, তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে হতে অধিকতর বাধা দেয়। (এই অপকর্ম হতে) নিবৃত্ত হয় না। বরং

তারা অহংকারে স্ফীত। কাজেই এরা যদি সুপরিচিত ও চিহ্নিত লোক না হয়ে থাকে, তাহলে কুরআন করীম এখানে কাদের উল্লেখ করলো—যাদের কাছে সাহাবারা যেতেন? কাদেরকে বুঝাতেন? এর মোকাবেলায় কারা অহংকারে মাথা নাচাতো? এবং তারা কে ছিল যারা এতদ্‌সত্ত্বেও খোদার পথে এগিয়ে আসতে মানুষকে বাধা দিত এবং ক্রমাগত অহংকারে স্ফীত থাকত? তারা সুপরিচিত নির্দিষ্ট লোক ছাড়া আর কারাইবা হতে পারে?

"সাওয়া-উন আলাইহিম আস্তাগফারতা লাহুম আম লাম তাস্তাগফেরলাহুম লাইঁ ইয়া-গফেরাল্লাহু লাহুম; ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্‌দিল কাওমাল ফাসেকীন।"—তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তাদের জন্য উভয়ই সমান। প্রশ্ন উঠছিল যে, তাদের হৃদয়ে যদি মোহর মেরে দেয়া হয়ে থাকতো তাহলে কি ইস্তে-গফারের দ্বারা তাদের কোনও উপকার হতে পারতো? আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইস্তেগফার কি তাদেরকে আযাব (ঐশী-শাস্তি) থেকে বাঁচাতে পারতো? সাহাবাগণই বা আশান্বিত চিত্তে কেন তাদেরকে তৌবার জন্যে আহ্বান করতেন? যখন কিনা আল্লাহ্‌তা'লা বলছেন, 'যাদের অন্তরে আমরা মোহর মেরে দেই, তাদেরকে কোন নবীর ইস্তেগফারও বাঁচাতে পারে না।' তাদের তক্‌দীর (বা নিয়তি) চিরতরে লিখিত (নির্দিষ্ট) হয়ে গেছে যে, তারা হেদায়াত পাবে না। আল্লাহ্‌ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং আল্লাহ্‌ পাপা-চারী দুষ্কৃতিপরায়ণদেরকে হেদায়াত দেন না।

"হুমুল্লাযীনা ইয়াকূলূনা লা তুনফেকূ আলা মান ইন্দা রাসূলিল্লাহে হাত্তা ইয়ানফাদ্দূ।" —এরা এতো দুষ্কৃতিপরায়ণ লোক যে, ঘোষণা করে বেড়ায়, "আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট যারা আছে তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না, এমন কি তারা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যায়।" এখানে তারা ইঙ্গিতে মানুষকে এ প্রলোভনও দিচ্ছে, তাঁর (সাঃ) সঙ্গ ছেড়ে দিলে তারা তাদেরকে টাকা-পয়সা দিবে। সকল দিক দিয়ে তাদের সাহায্য করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আজকাল জার্মানীতেও অনুরূপ অভিযানই চালু রয়েছে। বিপুল সংখ্যায় বসনিয়ান আহমদীয়া জামাতে দাখিল হয়েছেন ও হচ্ছেন। তাই আবার বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা আহমদীয়া জামাতের বিরোধী চিহ্নিত মহলের পক্ষ হ'তে তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে, যাতে তারা আহমদীয়্যত হতে তাদের সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ সকল বোসনিয়ান, তবলীগের ময়দানে যারা অত্যন্ত অগ্রসরমান, যারা অতীব গাম্ভীর্যপূর্ণ, ভদ্র ও নিষ্ঠাবান, যাদের কথা অন্যদেরকে প্রভাবান্বিত করে, তারা জানিয়েছেন যে, তাদেরকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, "আমরা তোমাদেরকে মাসিক এতো হাজার ডলার দিতে থাকবো, তোমরা আহ্‌মদীয়্যত ছেড়ে দাও।" তাঁরা তাদের ঐ প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, "আমাদের ঈমান বিক্রিযোগ্য

নয়। কোন অবস্থাতেই আমরা আহমদীয়া জামা'তকে পরিত্যাগ করতে পারি না।" ইসলামের প্রথম যুগেও অনুরূপ হয়েছিল এবং আজও তদ্রূপই ঘটছে। আমরা এর প্রত্যক্ষদর্শী। কুরআন করীমের বাণী প্রকৃতপক্ষে সর্বকালের জন্যে অমর ও শাশ্বত বাণী। মানব-প্রকৃতিসম্মত চিরন্তন বাণী। পৃথিবীর সূচনা হ'তে কিয়ামতকাল অব্দি ঘটমান অপরিবর্তনীয় ঘটনা ও অবস্থাবলী মানবপ্রকৃতির সূত্র ধরে ইহাতে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে ঐ মুনাফিকদের উক্তি বর্ণিত হচ্ছে যে, "তাঁর (সাঃ) চারি পার্শ্বে তোমরা যারা একত্রিত হয়েছ, তোমরা যদি তাঁকে (সাঃ) পরিত্যাগ কর, তাহ'লে আমরা তোমাদেরকে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ করে দিব।' আল্লাহ্ বলছেন: 'ওয়া লিল্লাহে খাযায়িনুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে'—নির্বোধ ব্যক্তিরা ভুলে যায় যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। এরা কাকে কী দিবে! "ওয়া লাকিন্নাল মুনাফিকীনা লা ইয়াফ্কাহূন"—মুনাফিকরা এমনই নির্বোধ যে, এসব কথা তারা বুঝে না।

তদোপরি, "ইয়াকূলূনা লা-ইর্ রাজা'না ইলাল মাদীনাতে লা-ইউখ্রেজান্নাল আয়ায্যু মিনহাল আযাল্লা"—তাদের মধ্যে এ ধরনের হতভাগাও রয়েছে যারা বলে, 'আমাদেরকে মদীনায় ফিরে যেতে দাও। তারপর সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দিবে।' "ওয়া লিল্লাহিল ইয্যাতু ওয়া লিরাসূলিহী ওয়া লিল মুমিনীনা"—যেমন ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে, তেমনি সমস্ত প্রকারের (প্রকৃত) সম্মান ও মর্যাদাও আল্লাহ্রই নিকটে বিদ্যমান। এই সকল সম্মান তাঁর রসূলের জন্যেই এবং মুমেনদের জন্যে অবধারিত। "ওয়া লাকিন্নাল মুনাফিকীনা লা ইয়া'লামূন"—কিন্তু মুনাফিকরা তা মোটেই জানে না।

আমি আলোচ্য বিষয়ের সূত্রপাত করেছিলাম এ কথার দ্বারা যে, আল্লাহ্তা'লার অবমাননাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিনতম ও গুরুতর অবমাননা। (১৫/৭/৯৪ তারিখের খোৎবা দ্রষ্টব্য—অনুবাদক)। আল্লাহ্তা'লার সত্তার মাধ্যমেই প্রত্যেক প্রকার পুণ্যের উৎপত্তি ও তাঁর মাধ্যমেই প্রত্যেক পুণ্যবান—তিনি রসূল হোন বা অ-রসূল, অস্তিত্ব লাভ করে থাকেন। যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদার উৎসও আল্লাহ্তা'লাই। আল্লাহ্র সম্মান বাদ দিয়ে কোনও সম্মান অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই রসূল-অবমাননার বিষয়বস্তু আল্লাহ্তা'লার অবমাননার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এটাকে উপেক্ষা করে তোমরা কী সব বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছ?! আল্লাহ্র অবমাননার যদ্দূর সম্পর্ক, কুরআন করীম এ বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। আর কোন একটি ক্ষেত্রেও মানুষকে এর জন্যে শাস্তি প্রদানের অধিকার দেয়নি। একটি আয়াত (লা তাসুব্বুল্লাযীনা··· ৬:১০৯), ইতোপূর্বে পেশ করে উহার বক্তব্য বিষয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করে এসেছি। আরেক আঙ্গিকে আলোচ্য বিষয়টি পবিত্র

কুরআন হতে আমি উপস্থাপন করতে চাই। ইহা কোন কোন জাতীয় আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। জাতিগত আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বলেছেন যে, কোন কোন ধর্ম বা জাতির এ ধরনের আকীদা রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ্র খোলাখুলি অবমাননা পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের সবচেয়ে অবমাননাকর আকীদা খৃষ্টানরা পোষণ করে থাকে। উহা কুরআন করীমে ঐ আঙ্গিকেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন (সূরা মরিয়ম : ৮৯-৯৬ আয়াতসমূহে) আল্লাহ্তা'লা বলেছেন : "ওয়া কালুত্তাখাযার রহমানু ওলাদা"—এরা ঘোষণা দেয় যে, রহ্মান খোদা (নিজের জন্যে) এক পুত্র গ্রহণ করেছেন। "লাকাদ জি'তুম শাইয়ান ইদ্দা"—নিশ্চয়, তোমরা এক অতি গুরুতর (মন্দ) কথা বলে বেড়াচ্ছ। এটা এত গুরুতর কথা যে—"তাকাদুস্ সামাওয়াতু ইয়াতাফাত্তারনা মিনহু ওয়া তানশাক্কুল আরদু ওয়া তাখিররুল জিবালু হাদ্দা'—আকাশসমূহ ফেটে যাবার ও পৃথিবী চৌচির (বিদীর্ণ) হবার এবং পর্বতমালা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ইহা বলা যে, খোদা-তা'লা পুত্র গ্রহণ করেছেন বা তাঁর সন্তান আছে, এর চেয়ে গুরুতর খোদার অবমাননা আর হতে পারে না। "আন দায়াও লিররাহ্মানে ওলাদা"—উল্লিখিত বিপর্যয়গুলো যেজন্যে ঘটার উপক্রম হয়েছে উহা এতো গুরুতর যে, উহা পুনর্ব্যক্ত হয়েছে এই বলে—'কারণ তারা রহ্মান আল্লাহ্র প্রতি পুত্র আরোপ করেছে'। "ওয়া মা ইয়ামবাগি লির্রাহ্মানে আই'ইয়াত্তাখিযা ওলাদা"—অথচ ইহা রহ্মান খোদার পক্ষে সমীচীন নয়, ইহা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন। "ইন কুল্লু মান ফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরযে ইল্লা আতির রহ্মানি আব্দা"—আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে রহমান খোদার সম্মুখে তাঁর বান্দা ও দাসরূপে হাযির হবে না। কেউ তাঁর সম্মুখে পুত্ররূপে হাযির হবে না, হতে পারে না। "লাকাদ আহ্সা-হুম ওয়া আদ্দাহুম আদ্দা'—নিশ্চয় তিনি এসব লোকদের (খোদা-অবমাননাকারীদের) ঘিরে রেখেছেন এবং তাদেরকে যথার্থ ও অনুপুঙ্খরূপে হিসাব করে রেখেছেন। তিনি সম্পূর্ণভাবেই জানেন, তারা কি বলে এবং তাদের একজনও তাঁর গণনার বাইরে নয়। "ওয়া কুল্লুহুম আতীহে ইয়াওমাল কিয়ামাতে ফার্দা"—অবশ্য তারা প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন একাকী তাঁর সমীপে হাযির হবে।

এই হচ্ছে সেই ঈশ্বর-নিন্দা (আল্লাহ্র অবমাননা), যা একটা ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে বিদ্যমান। এটা আল্লাহ্তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন এবং এটার প্রতি তাঁর এতো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে, এর দরুন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্তা'লা পবিত্র কুরআনে কোথাও খোদার অবমাননাকারী কাউকেই কোনও প্রকারের দৈহিক শাস্তি দেয়ার অধিকার মানুষকে দেন নি।

তেমনি সূরা আল-কাহ্ফেও একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন : "কাবুরাত্ কালিমাতান তাখ্রুজু মিন আফওয়াহিহিম"—"ইহা অত্যন্ত জঘন্য ও মারাত্মক কথা যা

তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত (উচ্চারিত) হচ্ছে। "ইঁইয়াকূলূনা ইল্লা কাযিবা"—তারা এটা মিথ্যা বৈ অন্য কিছুই বলছে না।

এতো হচ্ছে আল্লাহ্‌র অবমাননা প্রসঙ্গে কুরআন করীমের বর্ণনা। এবং বিভিন্ন স্থলে (সূরা ও আয়াতসমূহে) যেখানেই নবী-রসূলদের ইতিহাসের উল্লেখ আছে সেখানেই তাঁদের বৈরী ও বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক খোদাতা'লার অবমাননার কথাও বর্ণিত হয়েছে। একজনের পর আরেকজন নবীর ইতিহাস কুরআনে পাঠ করে যান, আপনারা দেখবেন, সমগ্র কুরআনে এর অকাট্য ও সন্দেহাতীত সাক্ষ্যসমূহ বিদ্যমান রয়েছে যে, নবী-রসূলের বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্‌তা'লার নিন্দা ও অবমাননা করেছে। এজন্যেই আল্লাহ্‌তা'লা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে সম্বোধন ক'রে বলেন যে, "হে রসূল! তুমি এদের (তোমার বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও অবমাননাপূর্ণ) কথায় দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ো না, কেননা এই যালেমরা তো খোদার বিরুদ্ধেও অনুরূপ জঘন্য কথা বলতে থাকে। এইরূপে আল্লাহ্‌ ও রসূলের অবমাননা জনিত অপরাধকে তিনি একসাথে (একত্রে) বেঁধে দিয়েছেন। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ধৈর্য ধারণের ও উপেক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। কোথাও এ আদেশ দেন নি যে, তোমরা তলোয়ার হাতে এই অবমাননা ও কটাক্ষকারীদের মুণ্ডুপাত করতে আরম্ভ কর।

সাধারণভাবে এ জাতীয় অবমাননা সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক আয়াত আমি ছেড়ে দিলাম, কেননা এ সম্পর্কে সবাই অবগত আছেন। অধিক বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা সময় সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তামাম দুনিয়ার কোন একজন মৌলবীও আল্লাহ্‌র যেসব কালাম এবং তাথেকে প্রতিভাত শিক্ষা আমি পেশ করছি তা অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখেন না। কুরআন করীম খোদাতা'লার প্রতি বিদ্রূপ ও কটাক্ষের অসংখ্য বাক্যের (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) উল্লেখ করেছে এবং কোন একটি স্থলেও (আয়াতে) আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি এসব অবমাননার অপরাধে অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া মানুষকে নিজ হাতে গ্রহণের কোনও নির্দেশ কাউকেই দেন নি, সে ক্ষমতা ও অধিকার কোনও মানবকে দেননি।

কেবল পবিত্র কুরআনেরই না, বরং পূর্বেকার সমস্ত কিতাবেরই (ধর্মপুস্তকের) অব-মাননা করা হয়েছে। এবং কুরআনের অবমাননা সাবশেষ করা হয়েছে। সূরা আল-নিসার ১৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন:

"ওয়াকাদ নায্‌যালা আলাইকুম ফিল কিতাবে আন ইযা সামে'তুম আয়াতিল্লাহে ইউক্‌ফারু বিহা ওয়া ইউসতাহ্‌যাউ বিহা ফালা তাক্‌উদূ মায়াহুম হাত্তা ইয়াখূযূ ফী হাদীসিন গাইরিহি"—অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের জন্য এই কিতাবে (আর্‌শ থেকে) এই শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন যে, যখনই তোমরা আল্লাহ্‌র 'আয়াতসমূহ' সম্বন্ধে শুনবে যে, ওগুলোকে অস্বীকার করা হচ্ছে, (মনে রাখবেন, 'আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ' সংক্রান্ত বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক—সমগ্র নবীকুল আয়াতুল্লাহ্‌-এর অন্তর্ভুক্ত) তখন তোমরা কি করবে?

তখন কি তোমরা হাতে তলোয়ার ধারণ ক'রে অস্বীকার ও বিদ্রূপকারীদেরকে দ্বিখণ্ডিত করতে আরম্ভ করবে? কখনও না। বলা হয়েছে: "ফালা তাকউদ্‌ মায়াহুম" —তাদের কাছে বসো না। তবে কি সবসময়ের জন্যে 'বয়কট' বা সঙ্গ-ত্যাগ? তা-ও নয়। আল্লাহ্‌ বলেছেন: "হাত্তা ইয়াখূযু ফী হাদীসিন গাইরিহি"—যে পর্যন্ত না তারা উহা ব্যতীত অন্য কথায় রত হয়। কাজেই যখন তারা অন্য প্রসঙ্গে যায়, তখন সামাজিক মেলা-মেশার যে-সব রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা আছে, তদনুযায়ী তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। কিন্তু ঐ আসরে বসবে না যেখানে আল্লাহ্‌তা'লার আয়াতসমূহের বিদ্রূপ ও অবমাননা করা হয়। এই হচ্ছে কুরআনের শিক্ষা ও কুরআনী শাস্তির বিধান। ইহা এতো খোলাসাভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ বলছেন, বিশেষভাবে তোমাদের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে এই নির্দেশনামা অবতীর্ণ করা হয়েছে।

"ইন্নাকুম ইযাম্‌মিসলুহুম"—অনুরূপ অবস্থায় যদি তোমরা তাদের কাছে বসে থাক তাহলে, খোদা, রসূল এবং কিতাবের তো কোনই ক্ষতি হবে না। কিন্তু তাতে তোমরা নিজেদের ক্ষতি সাধন ক'রে বসবে—তোমরা অবশ্যই তাদেরই মত হয়ে যাবে। কাজেই তাদের মতন যেন হয়ে না যাও সেজন্যে তোমাদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে উক্ত হিকমতপূর্ণ শিক্ষা তোমাদের প্রদান করা হলো। আর তাদেরকে (কটাক্ষকারীদেরকে) যদ্দুর শাস্তি দানের প্রশ্ন, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেছেন:

"ইন্নাল্লাহা জামেউল মুনাফেকীনা ওয়াল কাফেরীনা ফী জাহান্নামা জামীয়া"—সেজন্যে তোমাদের কোন চিন্তা করার দরকার নেই; সেজন্যে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ স্বয়ং সকল মুনাফিক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (আল-নিসা: ১৪১)।

তারপর, আল্লাহ্‌ সূরা আল-আনআম: ৬৯ আয়াতে বলেছেন:

"ওয়া ইযা রায়াইতাল্লাযীনা ইয়াখূযূনা ফী আয়াতিনা ফাআ'রিয্‌ আনহুম হাত্তা ইয়া-খূযূ ফী হাদীসিন গাইরিহি"—

প্রথম সম্বোধন রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কেই করা হয়েছে। তারপর তাঁর অনুসরণে প্রতিটি উম্মতকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমাদের 'আয়াত-সমূহ' সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তদ্ব্যতীত অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। (অন্য আলোচনায় গেলে) তখন তাদের সাথে সামাজিকভাবে সম্পর্ক রাখা যায়। এই হচ্ছে আল-কুরআনের মাহাত্ম্য। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালামের (দেয়া) সাহসিকতা ও উদারতা। এই হচ্ছে ঐ শিক্ষা, যা মুসলমানদের ছাড়াও বিশেষভাবে হযরতে আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে প্রদান করা হয়েছে। এ সকল আয়াতের বিদ্যমানতায় ও উপস্থিতিতে এগুলোর বিরুদ্ধ ও ব্যতিক্রমী কোন শিক্ষা বা ব্যাখ্যা প্রচার করা বা গ্রহণ করা সর্বতঃ ও সরাসরি পবিত্র কুরআন ও খোদা-

তা'লার অবমাননার নামান্তর। যদি অবমাননায় কোনও শাস্তি থেকে থাকে তাহলে, ঐ সমস্ত লোকদেরকে ঐ শাস্তি প্রদান করা উচিত যারা খোলাখুলিভাবে কুরআনের শিক্ষার মোকাবেলায় বিদ্রোহ করছে এবং সেই শিক্ষাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করছে, যা আল্লাহ্-তা'লা বিশেষভাবে তাদের জন্যে নাযেল করেছেন। পরন্তু তারা কুরআনকে নিজেদের মনগড়া অর্থের প্রলেপ দিতে প্রয়াস পায়। আর যখনই তারা নিজেদের স্বপক্ষে তথাকথিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে, তখন তারা উক্ত আয়াতসমূহের উপর হাত রেখে দেন। তাদের ওখানে এ আয়াতসমূহের উল্লেখ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং তাকওয়াশীলতার চাহিদা হচ্ছে, যদি কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয় আর সে বিষয় সম্বন্ধীয় আয়াতসমূহ কুরআন করীমে মজুদ থাকে, সেগুলোকে উপেক্ষা করে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার কোন অধিকার কারও নেই। এ আয়াতগুলোকেও উপস্থাপন করুন। সবগুলোকে একত্র করুন, তারপর দেখুন, কুরআন করীমের প্রকাশ্য 'মুহ্কামাত' (দ্ব্যর্থহীন অকাট্য আয়াত) কী শিক্ষা দিচ্ছে এবং কী বিষয়বস্তু আপনাদের উপরে অবারিত করছে। যা কিছুই উহার বিরুদ্ধে যায় উহা রদ্ করার উপযুক্ত।

আজ মুসলমান দেশগুলোতে কোন কোন মধ্যযুগীয় উলামার পেশকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করা হচ্ছে। তদ্বারা অধুনা উলামা কর্তৃক বর্তমানকালের মুসলমানদের মনমানসিকতাকে বিকার-গ্রস্থ করে তোলা হচ্ছে। এবং এরূপ ভয়াবহ ও মারাত্মক ধ্যান-ধারণা ও মন-মেযাজে তাদেরকে গড়া হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের সাথে যেগুলোর কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। এসব উলামা কেবল রসূল-অবমাননার অপরাধেই অপরাধী নয় বরং তারা সারা বিশ্ব জুড়ে ইসলামের কলঙ্ক ও দুর্নাম সৃষ্টিকারীও বটে। এরা এমন ধরনের দুমুখো যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যখন তারা যায় তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা তাদের সামনে পেশ করে থাকেন। তখন আবার বলেন, ইসলাম তো হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উদারতা, ধৈর্য, সাম্য ও সহিষ্ণুতার ধর্ম। সকলের সহিত সমান ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। কাফের হোক, কি মুমেন—ইসলামের দৃষ্টিতে সকলের অধিকার সমান-সমান। উল্লেখযোগ্য যে, ইংল্যাণ্ডে এসে তারা ঘোষণা (বিবৃতি) দিতে থাকেন যে, 'আমাদের দেশে আহ্মদীদের এবং অন্যান্য সব মুসলমানের অর্থাৎ উভয়ের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সমান-সমান, কোনও পার্থক্য নেই। খৃষ্টানদের জন্যও কোন আশঙ্কা নেই। হিন্দুদের জন্যও কোন আশঙ্কা নেই। কারও জন্যই কোন আশঙ্কা নেই। এ সব হচ্ছে তাদের বিদেশের বুলি ও বিবৃতি। আর নিজেদের দেশে তাদের কী বিবৃতি ও ঘোষণা-বলী হয়ে থাকে এবং কী ভূমিকা রাখা ও তৈরী করা হয়, তার জাজ্বল্যমান একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কুরআন করীমের অবমাননার অভিযোগ দিয়ে জনৈক ব্যক্তিকে আদালতে পেশ করা ব্যতিরেকেই, কেবল মোল্লাদের ঘোষণাবলীর ফলশ্রুতিতে গুজরাঁওয়ালায় (পাকিস্তানে) যে জল্লাদী ষ্টাইলে মেরে ফেলা হয়েছে ঐ ঘটনার লোমহর্ষক বীভৎস বিবরণ পড়ে গা শিউরে

উঠে। "হাফেয সাজ্জাদ, গুজরাঁওয়ালা নিবাসী ১২ এপ্রিল '৯৪ এই অভিযোগ যে, সে কুরআন করীমের অবমাননা করেছে, কুরআনকে পুড়িয়েছে।—"এই অভিযোগ কীভাবে তার উপর এসে চাপলো? সে চা বানাচ্ছিল। কাছে রাখা কুরআন করীমের উপর ভুলক্রমে গরম চা পড়ে যায়। তাতে সে বেচারী অনুশোচনা ও ইস্তেগফারের ভঙ্গীতে বলে উঠে "আহা! আমার দ্বারা একী ঘটে গেল? হায়! গরম চায়ে কুরআন জ্বলে গেল!" তার স্ত্রী তা শুনে একটু উচ্চৈস্বরে বলে উঠলো, "আমাদের ঘরে এটা কী ঘটে গেল? কুরআন জ্বলে গেল!" দেয়াল ছিল জীর্ণ-শীর্ণ। প্রতিবেশী তার কথা শুনে ফেলে শোর তুলে দিল। মৌলবীদের নিকট কথা পৌঁছল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মসজিদের মাইকে বিকট ঘোষণা হতে লাগলো। হাঙ্গামার সৃষ্টি হলো। সমস্ত মহল্লার লোক মারমুখী হয়ে একত্র হয়ে পড়লো। পুলিশ ছুটে এলো। তারপর মাইক থেকে ঘোষণা অনুযায়ী পুলিশের হাত থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেড়ে নিয়ে কোন কিছুও জিজ্ঞাসাবাদ না করে সবাই মিলে তার জীবন সাঙ্গ করে দিল। একটি প্রকাশিত সংবাদ থেকে আমি আপনাদের শুনাচ্ছি: "মসজিদ থেকে ঘোষণা করা হয়, সবাই আপনারা থানায় পৌঁছুন এবং পুলিশের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেরা এই ব্যক্তিকে শাস্তি দিন! মসজিদসমূহ থেকে তাকে কতলেরও ফতওয়া জারী করা হয়। হাজার হাজার লোক থানার উপর আক্রমণ চালিয়ে ঐ ব্যক্তিকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং উলঙ্গ করে (মোল্লাদের ফতওয়া অনুযায়ী, নাউযুবিল্লাহ্ এসবই হচ্ছে কুরআনী শিক্ষা, যার ওপরে আমল করা হয়) তাকে পাথর মারতে শুরু করে। সে (অভিযুক্ত হাফেযে কুরআন) আল্লাহ্‌র দোহাই দিতে থাকে, 'আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কুরআনকে সম্মান করি'। কিন্তু কে তার কথা শোনে! প্রস্তরাঘাতে তাকে মেরে ফেলা হয়। তারপর তার লাশকে জ্বালানো হয়। এবং সেই পোড়া লাশকে মোটর সাইকেলের পিছনে বেঁধে শহরের অলি-গলিতে ছ্যাঁচড়ানো হয়। তারপর এই জ্বালা-পোড়া লাশকে আবার প্রস্তরাঘাত করা হয়। অবশেষে ঐ বিকৃত লাশকে পুলিশ উদ্ধার ক'রে রাতের অন্ধকারে 'মিয়ানী' কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে দাফন করে।" এখানে আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার আছে। কোন মৃত আহ্‌মদীর জানাযা যদি কবরস্থানে দাফন (সমাহিত) হতে যায় তাহলে কবরস্থানগুলোতে তাদের সমাহিত মৃতদের সম্পর্কে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার আতঙ্ক ও আশঙ্কা লেগে যায়। তারা বলতে আরম্ভ করে, এই আহ্‌মদীকে এখানে দাফন করলে পরলোগত বাকী সকলকে খোদা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন। তবে কুরআন অবমাননায় অভিযুক্ত ঐ ব্যক্তি যখন এতোই অভিশপ্ত ছিল (তাদের ধারণা অনুযায়ী), তখন তাকে ঐ কবরস্থানে দাফন করায় কবরস্থিত তাদের মৃতদের জাহান্নামে যাবার আশঙ্কা কেন জাগলো না?! মৌলবীদের দ্বারা গড়ে তোলা এ সেই যালেমানা স্বভাব-চরিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই প্রাসংঙ্গিকভাবে উল্লেখিত এ বীভৎস ঘটনাটি বর্ণনা করা হলো। এই স্বভাব-চরিত্রের অভিব্যক্তিকে পবিত্র কুরআন এবং

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে আরোপ করা কত ভয়ঙ্কর ঔদ্ধত্য! কত গুরুতর কুরআন ও রসূল অবমাননা! যদি কোন অবমাননার শাস্তি থেকে থাকে, তাহলে এই ঘটনার জন্য দায়ী মৌলবাদীদের সে শাস্তি হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন ও সহী হাদীস তো অবমাননার জন্য মানুষের হাত দিয়ে কোনও শাস্তি নির্ধারণ করে না। কিন্তু তাদের মতে যখন শাস্তি আছে, তখন তারা (পাকিস্তানী সরকার ও প্রশাসন) কেন ঐ মৌলবাদীদের মুখে কালি লেপন করলো না? কেন তাদের গ্রেফতার করলো না? কী চরম দুর্ভাগ্যজনক অপকর্ম তারা ঘটিয়েছে! আদল ও ইনসাফের সকল মাত্রা ও চাহিদাকে সিকোয় তুলে দিয়ে, ধর্মের ও মানবতার সকল মূল্যবোধকে খণ্ড-বিখণ্ড ও পিষ্ট করে, তোমরা পবিত্র কুরআনের দিকে ভ্রান্ত ও অন্ধকারময় শিক্ষা আরোপিত করেছ। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহান জীবনাদর্শের দিকে ভ্রান্ত শিক্ষা আরোপ করেছ। আবার নিজেরাই অভিযোগকারী এবং নিজেরাই বিচারকের আসনে বসে পড়েছ। আর ফয়সালা যা করেছ, ন্যায়-বিচারের সাথে উহার দূরতম সম্পর্কও নেই। যে দেশে ওরূপ বীভৎস ও ভয়ঙ্কর মন-মানসিকতার উদ্ভব ঘটানো হচ্ছে, তার পরিচয়ের কষ্টিপাথর এর চাইতে আর কী হতে পারে যে, কোনও মৌলবী—চরম হতভাগা মৌলবীকেও যদি কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় অনুরূপ ঘটনা ঘটলে তিনি (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাও কি ওরূপই করতেন যেমন তোমরা করেছ? তবে সে কখনও ঐ কসম খাওয়ার সাহস করতে পারবে না। সে জানে যে, সে মিথ্যেবাদী। সে জানে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত ও আদর্শের সাথে এ সবের দূরতম সম্পর্কও নেই।

যদ্দুর নবীদের অবমাননার প্রশ্ন, সে সম্পর্কে তো কুরআন করীমে ভুরি ভুরি আয়াত মজুদ রয়েছে। আপাততঃ কয়েকটি আয়াত আমি নমুনাস্বরূপ আপনাদের সামনে পেশ করছি। এগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় নবীদের অবমাননার উল্লেখ চলছে। কিন্তু কোন একটিতেও ওসব অবমাননাকারীকে শাস্তি দানের নির্দেশ বা এর ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেয়ার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেমন:

"কাযালিকা মা আতাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম মির রাসূলিন ইল্লাকানু সাহিরুন আও মাজনূন।" (সূরা যারিয়াত: ৫৩)—এভাবেই এদের পূর্ববর্তীদের নিকটও এমন কোন রসূল আগমন করেন নি, যাঁকে তারা একজন যাদুকর অথবা একজন উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করে নি। যাদুকর বা পাগল বলা মৌলবীদের দৃষ্টিতে সম্মানজনক, না অপমানজনক—কোন্‌টি? যদি অপমানাত্মক হয়ে থাকে তাহলে, বলুন এর শাস্তির উল্লেখ কুরআনে কোথায় আছে?

আরও বলা হয়েছে: "মা ইয়াতীহিম মির রাসূলিন ইল্লাকানু বিহি ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন।" (সূরা ইয়াসীন: ৩১)—তাদের নিকট এমন কোনও রসূল আসেন নি যার প্রতি তারা

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নি। বলুন, এটা রসূল-অবমাননা কি না? যদি নবী-রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা অবমাননা না হয়, তাহলে তোমাদের মতে অবমাননা আর কাকে বলে? যদি এটা অবমাননা না হয়ে থাকে—বস্তুতঃ এটা অবশ্যই অবমাননা—তাহলে এর শাস্তিদানের কথা কুরআনে কোথায় আছে?

সূরা আ'রাফে আছে: "ইন্না লানারা-কা ফী যালালিম্ মুবীন"—অর্থাৎ হে নূহ! আমরা তোমাকে চরম পর্যায়ের পথ ভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (আ'রাফ: ৬১) হযরত নূহকে আরও বলা হয়েছে: ইন্না লানারাকা ফী সাফাহাতিন ওয়া ইন্না লানাযুন্নুকা মিনাল কাযেবীন"—নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।" (আ'রাফ: ৬৭)। মৌলবীদের দৃষ্টিতে এ সব উক্তি নবীর অবমাননার কারণ কি না, কে জানে। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষের কাছে বলছি, যাদের বুদ্ধি বিকারগ্রস্থ হয় নি। নিজেদের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের চক্করে পড়ে যাদের চিন্তাশক্তি রহিত হয়ে যায় নি। এরূপ আরও বহু আয়াতে নবীদের বিরুদ্ধে কটূক্তির ধারাবাহিক উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু এসব বিভিন্ন ধরনের কটূক্তির জন্যে নবীদের অনুসারীদের প্রতি কটূক্তিকারীদেরকে নিজ হাতে শাস্তি দানের কোথাও কোন উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তেমনিভাবে নবীদের ব্যতীত তাঁদের পবিত্র পরিবারবর্গ, এমন কি তাঁদের মায়েদের চরম অবমাননার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের অপমানও অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। সাধারণ দুনিয়াদার ব্যক্তিরা তো আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কটূক্তির জন্য এতোটা উত্তেজিত হয় না যতটা তাদের নবীদের এবং নবীর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের অবমাননার জন্যে হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআন করীমকে একদিকে তো খৃষ্টানদের ঐ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তৌহীদবাদীদের জন্যে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ছিল। অন্যদিকে ইহুদী তৌহীদানুসারীদের ঐ বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা খৃষ্টানদের পক্ষে ন্যায়-সঙ্গতভাবেই উত্তেজিত হবার কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা কোনও শাস্তি দানের কথা বা ঘটনার উল্লেখ করেন নি। যেমন:

"ওয়া বি-কুফরিহিম ওয়া কাওলিহিম আলা মারইয়ামা বোহতানান আযীমা"—অর্থাৎ, ইহুদীরা এরূপ যালেম যে, তারা কেবল কুফুরীই করে নি, বরং মসীহের মায়ের উপরেও এতো জঘন্য অপবাদ আনয়ন করেছে, যার দরুন হযরত মসীহ (আঃ) বৈধ মানব সন্তান বলে গণ্য হবার অযোগ্য হয়ে পড়েন। ইহা অবমাননা নয় কি? এটা রসূল ও তাঁর মা উভয়ের এমন সম্মান-হানি নয় কি? যার জন্যে শাস্তি দান বিধেয় হলে তা অবশ্যই অবধারিত হওয়া উচিত ছিল। কাজেই এসব বিষয়কে তোমরা হিসেবের কোন খাতে গণ্য করবে? উক্ত আয়াতগুলোর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোর সাথে কী ধরনের

ব্যবহার করবে? যদি তোমাদের খায়েশ ও মনগড়া নীতি (মস্‌লা) অনুযায়ী তোমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হয় তা হলে উল্লেখিত প্রত্যেক অবমাননার ফলশ্রুতিতে তোমাদের পক্ষে হত্যা যজ্ঞ চালান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যে যদি তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার বিন্দু মাত্রও থেকে থাকে তাহলে, (খৃষ্টান ও ইহুদীদের বিশ্বাস সম্পর্কীয়) উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তলোয়ার হাতে একদিকে খৃষ্টানদের চরম ঈশ্বর-নিন্দা ও রসূল-অবমাননার শাস্তি বিধানের জন্যে ছুটে যাও। অন্যদিকে ইহুদীদের রসূল ও খোদা অবমাননার শাস্তি বিধানের উদ্দেশে ছুটে চল। এবং এটা দেখতে যেও না যে, এ কর্তব্য পালনের পথে তোমরা প্রাণ হারাবে, না তারা। যদি তোমাদের ঐ চিন্তাই পেয়ে বসে তাহলে, তোমাদের গায়রাত (আত্মমর্যাদাবোধ) কোথায় থাকলো! গায়রাত তো এরই নাম যে, মায়ের অসম্মান সাধিত হলে অপমানকারী যত বড় দুর্ধর্ষ যালেমই হোক না কেন, তার মোকাবিলা করতে গিয়ে সন্তানেরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করে দেয়, নিজেরা টুকরা টুকরা হয়ে যায়। গায়রাতের সবক তো মুরগীর কাছে শিখ। উহার ছানাগুলোর উপর চিল যখন ছোঁ মারে, তখন উহা তেড়ে উঠে হিংস্র চিলের মোকাবিলা করতে এতটুকুও পরোয়া করে না। তেমনি রক্ত-পিপাসু কুকুর, যার সামনে ইহা একেবারেই তুচ্ছ উহাকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। উহা তার ছানাগুলোর উপর আক্রমণ করলে তার প্রাণ যাবে কি যাবে না তার কোনও পরোয়া না ক'রে উন্মত্ত হয়ে সেই হিংস্র কুকুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হচ্ছে অতি সাধারণ জীবজন্তুর গায়রাতের দৃষ্টান্ত। কিন্তু তোমরা হচ্ছ এরূপ যালেম প্রকৃতির লোক যারা খোদা ও রসূলের গায়রাতের দোহাই দিয়ে থাক, কিন্তু পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াতে খোদাতা'লা ও নবীদের অবমাননার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলোর প্রতি চোখ বুজে অতিক্রম করে যাও আর বলতে থাক, এখানে নয়। খৃষ্টানরা বড়ই পরাক্রমশালী, এদেরকে আমরা কিছু করতে পারবো না। ইহুদীরা বড়ই শক্তিশালী, এদেরকেও আমরা কিছু বলতে পারবো না। আমরা তো কেবল সেখানেই নিজেদের গায়রাতের মহিমা দেখাতে যাব, যেখানে এমন ধরনের শক্তিশালীর দিকে তেড়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে, যাকে কতল করতে গিয়ে যেন আমাদের মুখমণ্ডলে কোন আঁচড়ও না পড়ে। এই হচ্ছে এদের ইসলামী গায়রাতের আদর্শ সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী। কতখানে যে এরা ইসলামের কত দুর্নাম ঘটিয়েছে সেগুলোর হিসেব করা দুষ্কর।

এ স্থলেও তারা এই বলে দায়মুক্ত হতে চায় যে, "হযরত মরিয়মের সম্পর্কে ইহুদীরা যা ইচ্ছা বলুক গিয়ে তাতে আমাদের কি যায় আসে।" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে তারা বলে থাকে, 'সব রকমের অসম্মান সহ্য করতে পারি, এমন কি খোদাতা'লার বে-ইজ্জতিও আমাদের সয়, কিন্তু মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অসম্মান আমরা সহ্য করতে পারি না।' এবার আসুন, কুরআন করীম থেকে আঁ-হযরত (সাঃ)-

এর অবমাননা সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং সেগুলোর প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি স্বরূপ উদ্ভূত পরিস্থিতি অধ্যয়ন করি। কুরআন করীম বলে:

"ওয়া কালাল্লাযীনা কাফারু ইন হাযা ইল্লা ইফ্‌কুনিফ্‌তারাহু ওয়া আয়ানাহু আলাইহে কওমুন আখারুন ওয়া কাদ জাউ যুলমাও' ওয়া যুরা।" (সূরা আল-ফুরকান: ৫) অর্থাৎ—"এবং যারা অস্বীকার (কুফরী) করছে তারা বলে, ইহা এক সূক্ষ্ম মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা সে (সাঃ) নিজেই রচনা করেছে। কেবল তাই নয়, বরং আরেক জাতির সে এজেন্টও বটে।—"ওয়া আয়া'নাহু আলাইহে"—এই মিথ্যা রচনায় অন্য এক জাতি তাকে সাহায্য করেছে। এই সাহায্যকারীরা ভেতরের লোক নয়, বরং 'আখারুন'—বিদেশী জাতি যারা তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। "ফাকাদ জাউ যুলমাও' ওয়া যুরা"—এরা সবাই মিলে এই গুরুতর যুলুম করেছে এবং জঘন্য মিথ্যা বানিয়েছে।" এসব উক্তি রসূল-অবমাননা নয় কি? যদি না হয়ে থাকে তা হলে, তোমাদের 'মানতিক' (Logic) কী? তোমাদের আক্কেল-বুদ্ধিরই বা কী ঘটে গেল? অবমাননা আর কাকে বলে? যদি (আয়াতে উল্লিখিত) এগুলো বিষয় অবশ্যই অবমাননা হয়ে থাকে তাহলে, দেখাও এর শাস্তি সম্বন্ধে কুরআনে কোথায় কি লিখা আছে।

পবিত্র কুরআন আরো বলে: "ওয়া কালু আসাতীরুল আওয়ালীনাক্‌তাতাবহা ফা হিয়া তুম্‌লা আলাইহে বুকরাতাও' ওয়া আসীলা।" (আল ফুরকান: ৬)

—"এবং তারা আরও বলে থাকে, এই সব হচ্ছে পুরনো লোকদের উপকথা, যা সে (সাঃ) লিখিয়ে নিয়েছে এবং এগুলো তার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় পড়ে শুনানো হয়।" কাফেরদের উক্তি এখানে কত গুরুতর! তিনি (সাঃ) নিজেও স্বীকার করেন যে, তিনি (সাঃ) লেখা-পড়া জানেন না, কাজেই কাউকে দিয়ে লিখে নিয়েছেন এবং অন্যরা তাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় পড়ে শুনাতে থাকে, যাতে ভুলে না যান (নাউযুবিল্লাহ্)।

অতপর, সূরা আল-মুমেনূনে আল্লাহ্ বলেন, এই অবিশ্বাসী যালেমরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আরো কতো রকমের দুঃখ-যাতনা দিয়েছে! তারা বলেছে: "ইন হুয়া ইল্লা রাজুলুনিফ্‌তারা আলাল্লাহে কাযেবাঁও ওয়া মা নাহ্‌নুলাহু বিমুমিনীন।" —'সে এমন ব্যক্তি বই আর কিছু নয় যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা ক'রে পেশ করছে, এবং আমরা কখনও তার উপর ঈমান আনবো না।' এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন? কী বলেছেন? তার অনুসারীবৃন্দকে কি তিনি এ আদেশ দিয়েছেন যে, উঠ এবং তলোয়ার হাতে তাদের মুণ্ডুপাত কর। ওরূপ আদেশ কখনও দেন নি। পরবর্তী আয়াত হচ্ছে:

"কালা রাব্বিন্‌সুরনী বিমা কায্‌যাবুন।"—"সে বল্‌ল, হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তারা আমাকে মিথ্যেবাদী আখ্যায়িত ক'রে প্রত্যাখ্যান করেছে। তুমি আমাকে সাহায্য কর।"

অতঃপর আঁ-হযরত (সাঃ)-কে উন্মাদ বলা হয়েছে। সূরা হিজর-এ আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন : "ওয়া কালু ইয়া আইউহাল্লাযী নুয্‌যিলা আলাইহিয্‌ যিক্‌রু ইন্নাকা লামাজ্‌নুন।"

অর্থাৎ—'হে সেই ব্যক্তি!' (সম্বোধনের ধারণটার দিকে লক্ষ্য করুন, কত যে কঠোর ও অবমাননাকর) 'যার উপর 'যিকর' (এই কুরআন) অবতীর্ণ করা হচ্ছে, নিশ্চয় তুমি পাগল। (এ ছাড়া আমরা তোমার সম্বন্ধে অন্য কিছুই ভাবতে ও বলতে পারি না)।'

"লাও মা তা'তিনা বিলমালায়িকাতে ইন কুন্তা মিনাস্‌সাদেকীন।"—'তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাদের কেন আনয়ন কর না?'

"ওমা নুনায্‌যলুল্‌ মালায়িকাতা ইল্লা বিল হাক্কি ওমা কানু ইযাম মুনযারীন।"—'আমরা ফিরশ্‌তাদের অবতীর্ণ করি না যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে, আর (যখন করি,) তখন তাদেরকে (কাফেরদেরকে) আর অবকাশ দেয়া হয় না।' অর্থাৎ শাস্তি তো আমিই (আল্লাহ্‌) দিব, তবে সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবার পরেই আল্লাহ্‌তা'লা ফিরিশ্‌তাদের পাঠান। আর যখন পাঠাবেন তখন এই লোকদের বাঁচার জন্যে কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

তারপর, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বার বার 'মজনুন' (পাগল) বলা হয়েছে : 'সূরা সাবা' : ৪৭ আয়াতেও বলা হয়েছে। এ জাতীয় আয়াত তো বহুল সংখ্যক। এগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। যেগুলোতে কিছু কিছু পার্থক্য আছে কেবল সেগুলিই পেশ করছি।

এখন আমি সূরা কালাম-এর আয়াত ৫২ উপস্থাপন করছি :

"ওয়া ইয়াকাদুল্‌লাযীনা কাফারু লা-ইউযলিকুনাকা বিআবসারিহিম লাম্মা সামিউয্‌ যিক্‌রা ওয়া ইয়াকুলুনা আন্নাহু লা-মাজ্‌নুন।"

এক দিকে তো তারা 'যিক্‌র' অর্থাৎ কুরআন খোদাতা'লার তরফ থেকে অবতীর্ণ হবার উল্লেখ করে ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভরে, অন্যদিকে যার উপর এই 'যিকর' অবতীর্ণ করা হচ্ছে তাকেও তাচ্ছিল্যের নিশানা বানিয়ে বলে, আল্লাহ্‌তা'লা এ ধরনের এক ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন যেন আর কাউকেই পেলেন না! তারপর যখন তারা (যারা অস্বীকার করেছে) এই উপদেশ-বাণী (যিকর) শ্রবণ করে তখন তারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই উপদেশবাণীর মধ্যে এরূপ শান ও মহিমা আছে যার দরুন তাদের অন্তরে আগুন জ্বলে উঠে। অন্যথায়, পাগলের প্রলাপে তো কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠে না। যদি সে নিজে পাগল না হয়ে থাকে, পাগলের কথায় তো আমরা কাউকে অগ্নিশর্মা হতে কখনও দেখি নি। পাগলের কথায় মানুষকে অবশ্য হাসি-বিদ্রূপ করতেই দেখা যায়। কিন্তু পাগলের কথায় কেউ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠে—এটা কখনও হতে পারে না। কাজেই মহান কুরআনের বর্ণনা-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করুন। এর মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়াকে খণ্ডনও করা হয়েছে। সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, তারা মিথ্যেবাদী। ইহা যদি পাগলের প্রলাপসুলভ উপদেশবাণী হতো তাহলে তোমাদের

গোসা এসে যায় কেন? আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: "অবিশ্বাসীরা যখন এই উপদেশবাণী শ্রবণ করে তখন নিশ্চয় তারা রোষভরা দৃষ্টি দ্বারা পারলে তোমাকে স্থানচ্যুত করে ফেলে এবং "ইকুলুনা ইন্নাহু লামাজ্‌নুন"—তারা বলে, 'এই ব্যক্তি অবশ্যই বদ্ধ পাগল'।

পাকিস্তান থেকে যারা এখানে (জলসায়) এসেছেন তারা জানেন যে, সেখানকার মৌলবীরা রোষভরা দৃষ্টিতে এমন ক'রে তাকায় যেন ওখানেই আহমদীদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিবে। এহেন স্বভাবই মানুষের মধ্যে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুগেও এমনতর স্বভাবের লোকদের একই অবস্থা ছিল। তাঁর পূর্বেও তাদের একই অবস্থা ছিল যে, কথা শুনা মাত্র তারা উত্তেজিত হয়ে পড়তো এবং রাগে চোখ লাল করে অনলবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করতো। আর বলতো, 'এ ব্যক্তি তো আস্ত পাগল'। যদি পাগলই হয়ে থাকে, তবে পাগলের প্রলাপে কিসে রাগ উঠে যায়?

অতঃপর, সূরা আল-ফুরকানের ৪২ আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন: "ওয়া ইযা রায়াওকা ইঁইয়াত্তাখিযু নাকা ইল্লা হুযুওয়া। আ হাযাল্লাযী বাআসাল্লাহু রাসূলা"—

অর্থাৎ—যখন তারা তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে তাদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু বানায় এবং ব্যঙ্গ ক'রে বলে, 'এই কি সেই ব্যক্তি! যাকে আল্লাহ্‌ রসূলরূপে আবির্ভূত করেছেন!' কত হেয় প্রতিপন্ন করার বাক্‌ভঙ্গী! এসব কথা উল্লেখ ক'রে খোদাতা'লা সমগ্র কুরআনের কোথাও মুসলমানদেরকে তলোয়ার হাতে এসব লোকদের মুণ্ডপাতের আদেশ দেয় নি। মৌলবীদের কানে শাস্তির কথা কেউ যদি দিয়ে থাকে তাহলে সে ঐ খোদা দেন নি যিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উপর কুরআন নাযেল করেছিলেন। বরং অন্য কেউ তাদের আত্মায় কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। সেই মহান আল্লাহ্‌র কি তখন (কুরআন অবতরণকালে) স্মরণ ছিল না যে, অনাগত ভবিষ্যতে তাঁকে অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ কতে হবে এবং তা-ও মানুষের হাত দিয়ে? কাজেই কুরআন নুযূলের সময় তো খোদা তা করেন নি। তবে মৌলবীরা এসব কথা কোত্থেকে খুঁজে পাচ্ছে? তাদের মনে এসব কথা কোত্থেকে ভেসে আসলো? এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, অন্য কোন ব্যাপার আছে, যা তাদেরকে এসব বলতে প্ররোচিত করছে।

আল্লাহ আরও বলেছেন: "লাকাদি স্‌তুহ্‌যিয়া বিরুসুলিম্‌ মিন কাব্‌লিকা ফাহাকা বিহিম মা কানু বিহি ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন।"—"এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, ফলে তাদের মধ্যে যারা হাসি-বিদ্রূপ করেছিল, উহাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল যা নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রূপ করতো। (আন্‌-আনআমঃ ১১) অর্থাৎ তাদের সেই হাসি-বিদ্রূপ তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। অন্যকথায়, খোদাতা'লার তকদীর

তাদেরকে শাস্তিদানের জন্যে ঐ সমুদয় বিষয়কে তাদের দিকেই পাল্টে দিল যা তারা নবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো।

"ওয়া ইযা রায়াকাল্লাযীনা কাফারূ ইঁইয়াত্তখিযুনাকা ইল্লা হুযুওয়া আহাযাল্লাযী ইয়ায্কুরু আলিহাতাকুম।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৩৭) —অর্থৎ এই অস্বীরকারীরা যখনই তোমাকে দেখে, হাসি-বিদ্রূপ করে এবং বলে, এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মাবূদদিগের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে থাকে। দেখ, দেখ, এর চেহারা দেখ।" এ সব কি সম্মানজনক কথা! যদি না হয় তাহলে, এ সব অবমাননার জন্যে কুরআন করীম কোথায় শাস্তি নির্ধারণ করেছে? এ সব কিছু শ্রবণ করার পর হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে কি আচরণ ও নমুনা দেখিয়েছেন? এ সম্পর্কিয় আয়াতসমূহ তো নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এক দিকে বিগত সকল নবী-রসূলের অবমাননার উল্লেখ করে, আর অন্য দিকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি হাসি-বিদ্রূপ ও কটাক্ষকে বর্ণনা করে। এবং বিগত নবীদের সম্বন্ধে বর্ণিত কটাক্ষের তুলনায় হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত কটাক্ষের বর্ণনা ব্যবধানে অধিক বলে প্রতীয়মান হয়। তবুও কোথাও শাস্তির উল্লেখ নেই।

তাঁর (সাঃ) বিরুদ্ধে এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম নষ্টকারী। আবার তাঁকে কবি বলা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, 'আমরা তো সেই সময়ের অপেক্ষা করছি যখন উহার ঘাতপ্রতিঘাৎ তাকে (সাঃ) চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করে রেখে দেয়'—'কুপ্রবৃত্তিতাড়িত বিক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণার বশবর্তী ব্যক্তি'। —এই যুগের মৌলবীরাও অবিকল ঐ সব শব্দই ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে, একই ধারায় যা নবীদের বিরুদ্ধে আবহমান কাল থেকে ব্যবহার করা হয়েছিল, বরং অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা ও গালমন্দ উচ্চারণ ও নিকৃষ্ট আচরণে পূর্ববর্তী সকল যুগকে তারা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া অবিশ্বাসীদের মো'জেযার অস্বীকার প্রসঙ্গে তারা বলেছে, 'অসংখ্য মোজেযার দাবী! অথচ একটি মো'জেযাই আমাদেরকে পেশ ক'রে দেখিয়ে দিক, তবে আমরা মানব। এ তো একটি মোজেযাও পেশ করতে পারবে না।' এ কথাগুলো আমি কুরআন থেকে অতীতকালের বর্ণনা করছি। কিন্তু অবিকল এ কথাগুলোই পাকিস্তানের মোল্লারা বলে থাকে। আহ্মদীদের কাছে অনুরূপ-ভাবেই মোজেযার দাবী জানিয়ে থাকে। তারা বলে, 'তোমরা তো বল, মির্যা সাহেব অনেক মোজেযা দেখিয়েছেন। মাত্র একটিই পেশ করে দেখাও।' যিনি মোজেযার সরদার (সাঃ) ছিলেন, যাঁর মাধ্যমে মোজযোর সাগর প্রবাহিত হয়েছে। যাঁর উপর অবতীর্ণ কালাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এর আয়াতসমূহ ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বাবলীকে লিখার জন্যে যদি সমুদ্র কালি হয়ে যায় এবং বৃক্ষরাজি কলম, তবুও তা লিখে শেষ করা যাবে না, যদিও সমুদ্র ও বৃক্ষ নিঃশেষ হয়। এই হচ্ছে কুরআন করীমের 'কলেমাত' বা মো'জেযা

সম্পর্কে দাবী [তাছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের অগণিত মো'জেযা ও নিদর্শনাবলী রয়েছে]। তা সত্ত্বেও ঐ যুগের অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে কুরআনেই বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছে, 'মাত্র একটি আয়াত বা নিদর্শনই আনয়ন করে দেখাও। তাহলে আমরা মেনে যাব'। আল্লাহতা'লা এরও জবাব দিয়েছেন :

"ওয়া আকসামু বিল্লাহি জাহদা আইমানাহুম"—তারা খোদার কসম খেয়ে খেয়ে ঘোষণা করে থাকে, "লাইন জায়াতহুম আয়াতুন লাইউমিনান্না বিহা"—মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ একটিও আয়াত যদি আনয়ন করতে পারেন তাহলে অবশ্য অবশ্যই তারা উহার উপর ঈমান আনবে। আল্লাহ্ বলছেন, "ইন্নামাল আয়াতু ইন্দাল্লাহি ওয়ামা ইউশ্‌য়িরুকুম আন্নাহা ইযা জায়াত লা ইউমিনুন।"—আল্লাহ্‌র নিকট তো অসংখ্য আয়াত রয়েছে কিন্তু কী ক'রে তোমাদের বুঝাবো, এই হতভাগারা মিথ্যেবাদী। সমগ্র আয়াতও যদি উপস্থাপিত করা হয় তবুও এরা মানবে না। পূর্বের আয়াতগুলো কি অল্প-স্বল্প, যা তারা অস্বীকার করে বসে আছে? আর কোন্ আয়াত তাদের জন্য ঈমান আনয়নের কারণ হবে?।" অতএব অতীত কালের নবীদের সাথে এটাই ছিল এদের আচরণ এবং এ আচরণই ছিল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সাথে। কুরআন করীমে ইহাও বলা হয়েছে যে, ওরা তোমার কথা শোনার (জানার) জন্য সদা খোঁজ খবর রাখে। কিন্তু যখন তা শুনে তখন বিদ্রূপ করে। (অর্থাৎ বিদ্রূপ ও প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যেই শুনে)। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাথে এটাই ছিল তাদের চিরায়ত আচরণ। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব অসদাচরণ ও অবমাননার জন্যে কখনও দৈহিক শাস্তি প্রদানের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি বা গ্রহণের নির্দেশ দেন নি। তাঁকে আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হতে এ জাতীয় কোন শিক্ষাও দেয়া হয় নি।

যদ্দুর তাঁকে নির্দিষ্টভাবে অবমাননা করার সম্পর্ক, যদ্দুর তাঁকে কটাক্ষ করার নির্দিষ্ট ঘটনার সম্পর্ক, ওটার উল্লেখ সূরা আল-মুনাফেকূন-এর প্রথম রুকূর শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে যা আমি খোৎবার শুরুতে তেলাওয়াত করেছিলাম। সে আয়াতটি হচ্ছে : "ওয়া ইয়াকুলুনা ইযা রাজাউ ইলাল মাদীনাতে লাইউখ্‌রিজান্না আয়ায্‌যু মিনহাল আযাল্লা"—অর্থাৎ তৎকালীন মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ বিন্ উবাই বিন সলুলের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্টতা সম্বন্ধে কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, এর Identity নেই। আল্লাহ্ বলেছেন : মুনাফিকরা বলে ছিল, তারা মদীনায় ফিরে গেল সেখানকার সবচে' সম্মানিত ব্যক্তি (আবদুল্লাহ্ বিন উবাই) সেখানকার সবচে' লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে [নাউযুবিল্লাহ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে] সেখান থেকে বের করে দিবে। এর চাইতে রসূল-অবমাননা অন্য কোন কিছুই কল্পনাও করা যায় না, যা এক ব্যক্তি এবং তার সাথীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে ফিরে এবং এর প্রচার করে বেড়ায়। "ওয়া লিল্লাহিল ইয্‌যাতু ওয়ালিরাসূলিহি"—"অথচ সমস্ত ইজ্জত

আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূলের এবং তাঁদের সুবাদে মুমেনদের এর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।" "ওয়া লাকিন্নাল মুনাফিকীনা লাইয়া'লামুন"—কিন্তু (অবাক কাণ্ড) মুনাফিকরা তা জানে না। এই ঘটনা বণী মুস্তালিক যুদ্ধ হ'তে ফিরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এক ঝরণা থেকে পানি নেয়ার অপেক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে একটা ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল। এর পরিণামে আবদুল্লাহ বিন সলুল এক পর্যায়ে এর সুযোগ নিয়ে মদীনাবাসী আনসারকে মুহাজেরদেরকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যে, এবং আজ তার বিগত সকল লাঞ্ছনার প্রতিশোধ তুলে নিবার সুযোগ লাভ হয়েছে বলে সে উক্ত অভিশপ্ত ঘোষণাটা করেছিল। এর পরিণতিতে কী হয়েছিল? সীরাতে ইবনে হিশামে তার বিবরণ পরিলক্ষিত হয়। তেমনি দুর্‌রে মনসুর এবং সুইউতির মাঝেও। অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত উক্তিটি সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ সীরাতের উল্লেখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল যখন এই অপকর্মটি করলো, তখন সাহাবীরা নিজেদের ভেতর দারুণ উত্তেজনা বোধ করলেন। কিন্তু কোন সাহাবীও আইনকে নিজ হাতে গ্রহণ করেন নি। বাহ্যতঃ যদিও তাদের প্রতীতি হয়েছিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য-অবশ্য হত্যা-যোগ্য হয়ে পড়েছে। তারা একজন একজন করে সবাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং আবেদন করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করুন, আমরা এই ব্যক্তির মস্তক উচ্ছেদ করে দিই।' আঁ-হযরত (সাঃ) কাউকে অনুমতি দিলেন না। এমন কি, ঐ মুনাফিক সরদারের পুত্র, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি আবেদন জানালেন, "সম্ভবতঃ আপনি অন্যকে এজন্যে অনুমতি দেন নি যে, আপনার ধারণা থাকতে পারে, পরবর্তীতে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আমার অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে আমি তাকে আবার হত্যা না করে ফেলি। কাজেই এর সমাধান হচ্ছে এই যে, আমিও তো মুসলমান। আমারও তো গায়রাত উত্তপ্ত হচ্ছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমার হাতে পিতার মস্তকচ্ছেদ করি। আঁ-হযরত (সাঃ) বল্‌লেন, "তোমাকে এর এতটুকুও অনুমতি নেই।"

রসূল-অবমাননার সুনির্দিষ্ট ঘটনা কুরআন মজীদে লিপিবদ্ধ। কোন মোল্লা-মৌলবী কি এর চেয়ে অধিক রসূল অবমাননা সংক্রান্ত কোন হাদীস পেশ করতে সক্ষম? যার মধ্যে রসূল-অবমাননার বিষয় অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তা কুরআনের বর্ণিত বিষয়ের পরিপন্থী বর্ণিত হয়েছে। তা কখনও সম্ভব নয়। কুরআন করীমের স্পষ্ট বর্ণিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন হাদীস থাকলে, ওরূপ প্রত্যেকটি 'হাদীস' প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মুখনিঃসৃত হাদীস নয় বলে কুরআনের সাথে সংঘাতের ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। উহা তো হাদীস নয় বলেই সাব্যস্ত হবে। অতএব, মৌলবী যখন সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেও

যখন হাদীসের আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে তখন দু'টি অবমাননার ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা দেখায়। এক, কুরআন করীমের উপর হ'তে মানুষের আস্থা নষ্ট করে কুরআনকে বাদ দিয়ে হাদীসের দিকে নিয়ে যায়। দুই, হাদীসের উপর হ'তে আস্থা নষ্ট করে এবং স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) -এর সত্তার উপর হ'তে মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধায় ফাটল ধরিয়ে দেয়। কেননা কুরআন করীমের মধ্যে যেমন স্ববিরোধ নেই, তেমনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যেও স্ববিরোধ নেই। উভয়ের মধ্যেও কোন বিরোধ নেই, কখনও হতে পারে না। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন হাদীস (উক্তি বা কর্ম) কুরআন করীম বিরুদ্ধ কোনও বিষয় বা ভূমিকা পেশ করে—এটাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমনটিকে হাদীস বলাও ধৃষ্টতা। উহাতে আবার এমন কিছুও থাকতে পারে যা তোমাদের জ্ঞানাতীত কিন্তু কুরআন করীমের কোন প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন হাদীসকে পেশ করা পবিত্র কুরআনেরও অবমাননা এবং হাদীসেরও অবমাননা তথা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও অবমাননা।

উল্লিখিত ঘটনাটি আলোচ্য বিষয়ে দ্ব্যর্থহীনরূপে আলোকপাতকারী এবং কল্পনাতীতও বটে। পবিত্র হাদীসে উহার বিবরণ সংরক্ষিত। যখন ঐ ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ বিন উবাই) মারা গেল, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে হত্যা করার অনুমতি কাউকে দেন নি—বলে সে স্বাভাবিকভাবে মারা যায়; তখন আঁ-হযরত (সাঃ) তার জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাতে সাহাবীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ-ই মুখ খুলতে সাহস পেলেন না। হযরত উমর (রাঃ) পথ রোধ করে দাঁড়ালেন এবং নিবেদন করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই ব্যক্তি ছিল মুনাফিক। আপনি কি এর জানাযা পড়বেন?! হুযূর পাক (সাঃ) বললেন, 'হাঁ'। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'আপনার উপরে ঐ আয়াতসমূহ নাযেল হয়েছে যেগুলোতে উল্লেখ রয়েছে, 'যদি তুমি সত্তরবারও এদের জন্যে ইস্তেগফার কর তথাপি আমি এদেরকে ক্ষমা করবো না।' হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মোকাবেলায় হযরত উমরের বুঝবার অপারগতার প্রতি লক্ষ্য করুন। যদিও তিনি নিজেও অত্যন্ত ধীমান ছিলেন কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোকাবেলায় কোনও সাহাবীর বুঝার শক্তির কোন মূল্যই ছিল না। এ বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হয়েছে যে, যার উপর ঐ আয়াত নাযেল হয়েছে, উহার অর্থ ও বিষয়বস্তু তিনি অধিক বুঝতে পারেন। তখন রসূল করীম (সাঃ) তাঁর সে কথা শুনে হাল্কা মুচকি হাসি হেসে বললেন, "হে উমর! পথ ছেড়ে দাও। খোদা এই তো বলেছেন যে, সত্তর বারও যদি আমি ইস্তেগফার করি তবুও তিনি ক্ষমা করবেন না। তাহলে আমি সত্তর অপেক্ষা অধিকবার ইস্তেগফার করে নেব।" আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদীন।"

এই হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আর এই হচ্ছে কুরআন করীম! এরূপ

(অবশিষ্টাংশ ৩০-এর পাতায় দেখুন)

কৌলুল্ মাহ্দী (আঃ)

আল্হাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতিন

১। চারিদিকে আজ উগ্র কাফের এজিদ সেনা হানছে প্রায়
ইসলাম আজি "যয়নাল আবেদীন" সহায় সম্বল নাইরে হায়!

২। আহ্মদের (সাঃ) দীন সংরক্ষণের সু-ব্যবস্থায় কেহই নাই—
প্রত্যেকে আপন আপন কাজে, দীনের কাজে নাইরে হায়।

৩। গুমরাহির কী বান ডোকছে লক্ষ মানব মর্ছে ডুবে
চক্ষু বুজে কালের বে-হুস, দীনের দরদ নাইরে হায়!

৪। হে ধনাঢ্য নিদ্রাতুর,
এখনও কি অবহেলায় হারাবে অমূল্য ধন
দীনের মূল্য নিদমহলে—
ঘুমের ঘোরে ফেলে রেখে, রে-অভাগা হায়রে হায়!
... ...
নিশ্চিত নিরাপত্তা—
শত্রু যখন গর্জে উঠে ধ্বংসাত্বক কর্ম-কাণ্ডের ভাণে—
তখনই অদৃশ্য আমরা, অদৃশ্য বন্ধুর আপন আনন-কাননে।

(বিঃ দ্রঃ—হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ফার্সি দুররে সামীন হইতে) (ক্রমশঃ)

(২৯ পাতার পর)

প্রত্যেক অপবাদ হতে উভয়েই সম্পূর্ণ পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে অবস্থিত, যে অপবাদ এ যুগের মৌলবীগণ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং কুরআন মজীদের প্রতি কার্যতঃ আরোপ করছে। এই মহান আদর্শ-ভিত্তিক ভূমিকা ও আচরণের বিরুদ্ধে, যার সমর্থনে মহান কুরআন দণ্ডায়মান এবং সমগ্র ইতিহাস-এর সমর্থনে দণ্ডায়মান—যে ব্যক্তি কোনও কৃত্রিম ও জা'ল হাদীসের বা কোন আলেমের ফতওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলে, সে রসূল-অবমাননাকারী, সে কুরআন-অবমাননাকারী, সে আল্লাহ্তা'লার অবমাননাকারী। সে সমগ্র নবীকুলের অমর্যাদাকারী। প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সাক্ষ্যসমূহের বিরুদ্ধে কে আছে যে, কোনও নজির পেশ করতে পারে?! যেহেতু আলোচ্য বিষয়টি দীর্ঘতর এবং খোৎবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কাজেই আমি এর অবশিষ্টাংশ জলসার উদ্বোধনী ভাষণে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো এবং এ বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত সকল দিকে আলোকপাত করবো। ইনশাআল্লাহ্।

(ক্যাসেটে ধারণকৃত খোৎবার বঙ্গানুবাদ)

তুচ্ছ থেকে উচ্চে উঠার ডাক

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

০ জীবনে যত উপরে ওঠা যায় ততই সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। এতে শুভ অশুভ দু-ই থাকে। অশুভের বড় দিক হলো নীচে পড়ে গেলে ক্ষয়-ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা। এর যথার্থতা দৈহিক জীবনেই শেষ নয়। সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা আদর্শিক জীবনেও এর ব্যাপক অবস্থান। তাই ব্যক্তি, বংশ, দেশ-জাতি, উম্মাহ্ কোন কিছুই এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া মুক্ত নয়। উদাহরণ নেয়া যাক। গাছ বা উঁচু দালান থেকে পড়ে দু'চার জন হাত পা ভাংগে, কেউ হয়ত মারাও যায়। খুব উঁচু দিয়ে যাওয়ার দরুন প্লেন ক্রাসে কচিৎ কোন যাত্রী রক্ষা পায়। সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক জীবনে যারা যত উচ্চ স্তরে ও মর্যাদায় আসীন থাকেন তাদের পতন ততই ক্ষতিকর এমন কি চরম দুর্নাম এবং কলংকের কারণ হয়। দেশ, জাতি ও উম্মাহ্ হিসেবে সাধনা দ্বারা বিশ্ব-দরবারে যত উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হন তাঁদের পরবর্তীদের পতনও তেমনি দুঃসহ দুঃখ দৈন্য ও অমর্যাদার কারণ হয়। ইতিহাস এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ধারণ করে চলেছে।

০ উল্লেখিত প্রেক্ষিতে মোসলেম উম্মাহ্র উত্থান পতন বিবেচনা করা যাক।
সূরা আলে ইমরানের ৯ রুকূতে আল্লাহ্ বলেন :

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে ও তোমরা ন্যায়-সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস রাখ।'

আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) বলেছেন :

'নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারীস হন, কিন্তু তারা নবীদের নিকট থেকে কোন দীনার বা দিরহামের ওয়ারীস হন না বরং ইলমের (জ্ঞানের) ওয়ারীস হন।'

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস বড়ই তাৎপর্যবহ ও মহাকল্যাণের উৎস। এসবে হুযুর (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান অনুগামীদের বিশেষ করে আলেমদের উচ্চতম স্থান ও মর্যাদার কথাই বলা হয়েছে। লক্ষাধিক নবী-রসূলদের মধ্যে হযরত নবী করীম (সাঃ) যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনি তাঁর (সাঃ) উম্মতগণও। বিষয়টি এখানে শেষ হলে সব কিছুই আনন্দের হতো। পরবর্তী উম্মতরা নিষ্ঠা ছেড়ে দিবে না বা শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ্ যেসব শর্ত দিয়েছেন ওসবের প্রতি কখনও অবহেলা দেখাবে না এমন কথা কুরআন হাদীসের কোথাও বলা হয় নি। তা'ছাড়া কোন অবস্থাতেই তাদের পতন হবে না—এ নিশ্চয়তাও কুরআন হাদীসে মিলে না। আল্লাহ্ কুরআনের হেফাযতের পূর্ণ দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন। মুসলমানদের পতন না হওয়ার কোন দায়িত্বই তিনি নেন নি। বস্তুতঃ মোমেন হওয়া না হওয়া মানুষের স্বাধীনতার আওতাভুক্ত রেখেছেন। এজন্যেই মানুষের বিচার হবে। শেষ বিচারের ভার তাঁর হাতেই রক্ষিত আছে।

০ নানাভাবে আল্লাহ্ মানব জীবনের উত্থান পতনের কথা বলেছেন। পতন হতে বাঁচার নির্দেশনাও দিয়েছেন। এখানে কিছু উল্লেখ করা হলো :

(১) 'আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে অতঃপর আমি তাহাকে

হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান'। (সূরা ত্বীন)

(২) 'তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করিবেনই'। (সূরা নূর)

(৩) 'মহাকালের সাক্ষ্য, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর)

(৪) 'যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল অতঃপর উহা তাহারা বহন করে নাই। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ'। (সূরা আল জুমুআ)

উদ্ধৃত প্রথম আয়াতে মানব জীবনের সম্ভাবনার শুভ ও অশুভ দু'টো দিকের উল্লেখ আছে। ঈমান এনে সৎকর্মের মাধ্যমে শুভ দিকটার বিকাশ ঘটাতে হয়। এতে অফুরন্ত প্রতিদানের কথাও রয়েছে। নতুবা নাচাদাপি নীচে পতিত হয়। দ্বিতীয় আয়াতে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে খেলাফত দানের ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন এরূপ ভাবাও মহা অন্যায়। মুসলমানদের মধ্যে হতে কেন খেলাফত উঠে গেলো এর সহজ সরল অর্থ দাঁড়ায়, হয় তাদের ঈমানে বা আমলে অথবা উভয়টিতেই বড় রকমের ত্রুটি বাসা বেঁধে আছে। এসব ত্রুটি দূর না করে আন্দোলন দ্বারা যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তাতো বার বার প্রমাণিত হয়েছে। খেলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন আর বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঈমান এনে সৎকর্ম করার শর্তে। এ জামানার 'বান্দারা' নিজেদের সংশোধনের চেয়ে আন্দোলনে এতই পটু যে, তারা এর দ্বারা আল্লাহ্কে দাবী মানিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় (?)! তৃতীয় আয়াতে ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার সাথে সত্যের প্রচার ও ধৈর্য ধারণের তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ব নবীর মহান শিক্ষা ও আদর্শকে বিশ্বময় প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অতীব ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা এজন্য বিভিন্ন ধর্মের বহু বর্ণের, দেশের ও ভাষার, বহু আবহাওয়ায় বসবাসকারী ভিন্ন স্বভাব ও ভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে লালিত লোকের কাছে যেতে হবে। তাদেরকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজের কথা তথা সত্যকে তুলে ধরতে হবে। প্রত্যাখ্যান করলে আত্মশর্মা হলে চলবে না। গ্রহণ করলে তাদেরকে তালীম তরবীয়ত দিতে হবে। এর সবটাতেই ধৈর্য অপরিহার্য। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও ধৈর্যচ্যুত হন নি। ধৈর্য মোমেনের বড় মূলধন। চতুর্থ আয়াতটি মোমেনের জন্য খুবই গুরুত্ববহ। কুরআন যখন ইতিহাস হতে কোন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তখন এর তাৎপর্য সুদূর প্রসারিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টান্তে শুধু হেদায়াতই থাকে না ভবিষ্যদ্বাণীও থাকে। অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের ন্যায় আচরণ করো তবে তোমাদের অবস্থাও তাদের মতই হবে। সোজা কথায় এখানে বলা যায় তোমরা কুরআনে দেয়া দায়িত্ব পালন না করলে তোমরাও তাদের ন্যায় 'পুস্তক বহনকারী গর্দভে' পরিণত হবে। আল্লাহ্ সূরা ফাতেহায় এর সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়েছেন: যেমন—

'তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, কোপগ্রস্তদের পথেও নহে, এবং পথ ভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে।'

কোপগ্রস্ত ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ও দরজা খোলা আছে বলেই

সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ এই প্রার্থনাকে এতো গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বার বার তা স্মরণে আনি।

০ মোসলেম উম্মাহর পতনের সম্ভাবনা যে কত ভয়াবহ হয়ে বাস্তবে রূপ নিবে তা নিম্নে উদ্ধৃত হুযুর (সাঃ)-এর হাদীসে পাওয়া যায়:

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাদের মধ্য হইতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)

চতুর্দিকে তাকালে বিশেষ করে মোসলেম জাহানের চূড়ান্ত অধঃপতনের কথা ইরাক ইরানে যুদ্ধ, আফগানিস্তানের জঘন্যতম গৃহ-বিবাদ, দুই ইয়ামেনের একীভূত হয়ে পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইসলামি ভ্রাতৃত্বের চরম অবমাননার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত নতুন দেশ পাকিস্তানের আলেমরা ইসলামি আদর্শে দেশ ও সমাজ গড়ায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় বহন করছে। বিবেচনা করলে এই জামানাই যে 'সেই সময়' তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। আল্লাহর প্রিয়তম রসূল (সাঃ) যাদেরকে 'নিকৃষ্টতম জীব' বলেছেন তাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট তথা শুভ-সুন্দর-মহৎ কিছু কখনোই আশা করা যায় না। বরং এরূপ করতে যাওয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি আস্থাহীন হওয়াই নয়, চরম বোকামিও বলা যায়। প্রকৃতিতে প্রায়ই দেখা যায়, যে জিনিষ যত ভাল তা পচলে তত বেশী দুর্গন্ধ হয়। মোসলেম উম্মাহ্র বেলাতেও এ কথা খাঁটে। যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন একথা স্বীকার করতেই হবে তারা কতো উচ্চ হতে কতো তুচ্ছে পরিণত হলো।

০ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাও একই কথা ঘোষণা করছে। ইসলাম অর্থ শান্তি। তাই ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম। ইসলাম গৃহে, পথে-ঘাটে, চেনা-অচেনা সবার জন্য সর্বত্র শান্তি কামনার ধর্ম। বসতে সালাম, উঠতে সালাম, হাঁটতে সালাম, আসতে সালাম, যেতে সালাম। সালাম দিয়েই কালাম (কথা) শুরু হয়। তবু মোসলেম বিশ্বে শান্তি ঘর ছাড়া, সমাজ ছাড়া, দেশ ছাড়া। কারণ বোধ হয় উচ্চারিত সালামের সাথে আচরণের সংযোগ ও সমন্বয় নেই। সংযোগ ও সমন্বয় সাধন দ্বারা শান্তিকে পুনবাসিত করা যাবে এই দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের আছে। ইসলাম আরো বুঝায় স্রষ্টার কাছে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে মোমেনের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ একাগ্রচিত্তে মেনে চলা ও পালন করা এবং নিজের খেয়াল খুশীর পায়রবি বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ নিজের 'আমি' না থেকে আল্লাহ্র 'আমি' হয়ে যাওয়ায়। ইসলাম দিয়েছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর গভীর তাৎপর্য হলো মোমেনদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ভিন্ন আদর্শ বা ধর্ম হতে কোন নিয়ম নীতি আমদানী করার কোনই প্রয়োজন পড়ে না। যদি তাই করতে হয় তবে ইসলামের পূর্ণতায় যে মহা-আঘাত হানা হয় তা উপলব্ধি করার মত বোধ শক্তিও স্বার্থান্ধ ও ধর্মান্ধ মোল্লা ভাইয়েরা হারিয়ে বসেছেন। হৈ হল্লা দ্বারা তারা ইসলাম কায়েম করতে চান। অথচ উপলব্ধি করছেন না যে, ইসলামের জন্য তারা কেবল ভাষা পারভাষাই আমদানী করেছে না, আন্দোলনের উপাদান হিসেবে ব্লাস ফেমি আইন, লং মার্চ, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও এসবও 'কর্জ' করছেন। তাদের আন্দোলনে নিজেদের খায়েশে প্রণীত কর্মকাণ্ডে ইসলামের স্থান দখল করে বসে। এভাবেই

ইসলামকে বিকৃত করে তারা আনন্দে মাতায়ারা। অথচ তারা ভেবে দেখেন না যে, কোন নবী রসূল এ ধরনের কর্ম-পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হননি। তারা কোন কোন এনজিওর বিরুদ্ধে সাহায্য সহায়তার আড়ালে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের অভিযোগ আনছেন আবার তারাই খৃষ্টানী আইনের (ব্লাসফেমি) প্রবর্তনের প্রয়াশ দ্বারা ওসব এনজিওর এজেন্ট বা সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। এ সবই উচ্চ হতে তুচ্ছে পরিণত হওয়ার কারনে। যেসব কারণে শ্রেষ্ঠ উম্মতের মহাপতন ও আলেমগণ 'নিকৃষ্টতম জীবে' পরিণত হলো তা হতে মুক্ত হওয়ার একাগ্র সাধনায় তৎপর হওয়াই আবার তুচ্ছ হতে উচ্চে উঠার সুনির্দিষ্ট পথ।

০ বর্তমানে একমাত্র আহমদীয়া জামাতই প্রকৃত ইসলামের সন্ধান দিতে পারে। ইসলামের পুনর্জীবন ও পুনর্বাসনের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহদী (আঃ) দ্বারা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পূণ্য নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) (১৮৩৫-১৯০৮)। তাঁর ইন্তেকালের পর পুনরায় প্রকৃত ইসলামি খেলাফত কায়েম হয়েছে। এখন চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর নেতৃত্বে এই জামা'ত পরিচালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ৫৪টি ভাষায় কুরআনের তরজমা ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ১৪৩টি দেশে পাঁচ সহস্রাধিক প্রচার কেন্দ্র (মিশন) স্থাপন করে এ জামাত নিরলসভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে।

০ আমাদের বিনীত আবেদন—তাক্‌ওয়ার সাথে মুক্ত মন ও জাগ্রত বিবেক নিয়ে আমাদের কথা, আমাদের মুখ থেকে শুনুন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রত্যক্ষ করুন। আমাদের বই-পুস্তকাদি পড়ে বুঝার জন্য তকলিফটুকু নিন। কাছে এসে দেখুন আমরা শুধু আমাদেরই নয় আপনাদের জন্যও সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। আমাদের কথা, আমাদের দাবী আপনার কাছে সত্য প্রতিপন্ন হলে আমাদের সাথী হউন, সহযোগী ও সহকর্মী হউন। অসত্য বলে বুঝতে পারলে আমাদের ভুল ভেংগে দিন। হৃদয় নিংড়ানো দরদ দিয়ে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ মানুষকে ইসলাম বুঝানোর চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরই (সাঃ) উম্মত হওয়ার দাবী করে 'কাদিয়ানীদের আস্তানা' জবর দখলের জোর উচ্চারণ, তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালানো পোড়ানো, তাদেরকে দেশ ছাড়া করার স্লোগান, ১৯৯২ সালের ২৯শে অক্টোবর ৪নং বকশী বাজারস্থ তাদের হেড কোয়ার্টারে আগুন লাগিয়ে দেয়ার মধ্যে মহানবী (সাঃ) এর প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার কোন প্রতিফলন ঘটে কি? উল্লেখ্য যে, প্রেরিত পুরুষের অনুপম চরিত্র, মহান ব্যক্তিত্ব ও অনন্য সাধারণ মেধার কল্যাণ পরশেই মানুষের সব আবিলতা মুছে যায়। জোর করে কাকেও সত্য উপলব্ধি করানো যায় না বলেই ইসলাম প্রচারে এর কোন স্থান নেই। ইসলামি নিয়ম-নীতিতেই প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে আবার নিশ্চয় তুচ্ছ হতে উচ্চে উঠা অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হওয়া যাবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একাগ্রচিত্তে সে সাধনা ও প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌ আমাদের সবার সহায় হউন। আমীন।

তাহরীকে ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব ও আমাদের কর্তব্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ওয়াকফে জাদীদের পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে বলেন :

"এভাবে ওয়াকফে জাদীদের ফলাফল এবং এর সৌন্দর্যেরও অনুমান করা যায় না। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে অবস্থা তদনুযায়ী ওয়াফেকীনের সংখ্যা বেশী এবং চাঁদার আদায় কম। যখন আমি চাইলাম তখন ওয়াকফে জাদীদের বাৎসরিক সত্তর হাজার টাকার ওয়াদা আসল। কিন্তু ওয়াকেফীন ছিলেন ৩৪৫ জন। যদি ৫০/- টাকা করে প্রত্যেককে দেয়া হয় এবং সফর ইত্যাদির খরচও দৃষ্টিতে রাখা হয় আর অতিরিক্ত খরচ যদি সত্তর টাকা করে মাসিক ধরা হয় তাহলে ৩৪৫জন ওয়াকেফীনের জন্যে ২৫ হাজার টাকা মাসিক অথবা বাৎসরিক তিন লাখ টাকার প্রয়োজন হবে। আর এত টাকা আমাদের নেই বরং আমাদের আসল পরিকল্পনা তো ইহা যে, কমপক্ষে দেড় হাজার কেন্দ্র সারা দেশে স্থাপন করে দেয়া হয়। যদি একহাজার সেন্টারও খোলা হয় আর প্রত্যেক ব্যক্তির পিছনে মাসিক আনুমানিক ৭০/- টাকার খরচের হিসাব ধরা হয় তাহলে ৭০,০০০-/ টাকা মাসিক বা বাৎসরিক সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে। বাহ্যিকভাবে ইহা খুবই বেশী মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে কখনও নিরাশ করেন নি। এ জন্যে আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের জন্যে এ টাকার ব্যবস্থা করবেন, বরং আমার আশা এই যে, একদিন এথেকেও অধিক টাকা আসবে। যদি দেড় হাজার কেন্দ্র স্থাপিত হয় তাহলে করাচী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে যাবে। বাংলা-দেশ থেকেও খবর আসছে তাতে মনে হয় সেখানেও লোকদের দৃষ্টি ওয়াকফে জাদীদের দিকে নিবদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং একটি স্কুলের শিক্ষক লিখেছেন বরং তিনি নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন। আমি তাকে লিখেছি যে, তুমি কাজ শুরু করে দাও আমি তোমাকে মোয়াল্লেম নিযুক্ত করবো।... ... ...

অতএব যদি দেড় হাজার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেশের কোন অংশই ইসলাহ ও ইরশাদের আওতার বাইরে থাকতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানা ৩ লক্ষ বর্গ মাইলেরও ওপরে আর পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা প্রায় ৪৫ হাজার বর্গমাইল। আমাদের পরিকল্পনা এরূপ যে, এর মাধ্যমে চার চার পাঁচ পাঁচ বর্গ মাইলের জন্যে যেন এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আবার উন্নতি করলে দুই দুই বর্গ মাইলের মধ্যে এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করা যায় বরং আরও উন্নতি করলে এক এক মাইল এলাকার মধ্যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যদি আমরা প্রত্যেক মাইলে কেন্দ্র স্থাপন করতে পারি

(অবশিষ্টাংশ ৩৯ পাতায় দেখুন)

গুঁন্চা

(ফুল-কুঁড়ি)

(৫ থেকে ৭ বছরের ওয়াকফে নও এবং অন্যান্য শিশুর জন্যে তা'লীম তরবীয়তি পাঠ্যসূচী)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

পঞ্চম কিস্তি

রেসালত (রসূলের পদ বা ঐশী-বাণী প্রাপ্তি)

মা—তোমার তো ইহা জানা আছে যে, আমাদের প্রিয় নবীর পূর্ণ নাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাঁর (সাঃ) আম্মুর নাম হযরত আমেনা এবং তাঁর (সাঃ) আব্বুর নাম হযরত আব্দুল্লাহ্। আর তিনি (সাঃ) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন।

শিশু—মক্কা কোথায় ?

মা—সৌদী আরবে। সেখানে উঁচু নীচু পাহাড় রয়েছে। আর রয়েছে ধূ ধূ বালির মাঠ। তিনি (সাঃ) ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল রোজ সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। চান্দ্র মাসের হিসেবে উহা ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল (মতান্তরে ৯ই রবিউল আউয়াল —অনুবাদক)। আরবের লোকেরা তাঁর (সাঃ) জন্মের সনকে, ঐ সনে সংঘটিত একটি বিরাট ঘটনার মাধ্যমে স্মরণে রেখেছিল। উহাকে আসহাবিল-ফীল বা হস্তী-বাহিনী সম্পর্কিত সন বলা হয়।

শিশু—ইহা কোন্ ঘটনা ছিল ?

মা—ইয়ামেনের গভর্নর বহু সৈন্য সহকারে হাতীর পিঠে চড়ে এসেছিল মক্কায়। তারা মনে করেছিল যে, আজ খোদার ঘর খানা-এ-কা'বাকেই ধূলিসাৎ করে তবে ছাড়বো। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে বড় কঠিন শাস্তি দিলেন। তার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটি ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত সৈন্য বিনাশ হয়ে গেল। কুরআন করীমের 'সূরাতুল ফীল' নামক সূরায় এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

শিশু—তাঁর আব্বুর নাম তো হলো হযরত আবদুল্লাহ্ আর তাঁর দাদার নাম কি বলো না, আম্মু ?

মা—হযরত আবদুল মুত্তালিব। এ দুনিয়াতে আসার পূর্বেই তাঁর (সাঃ) আব্বু ইন্তেকাল

করেন। তাঁর (সাঃ) আম্মু হযরত আমেনা তাঁর (সাঃ) দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিবের কাছে থাকতে লাগলেন। তাঁর (সাঃ) আম্মু একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, তার মধ্য থেকে একটি জ্যোতিঃ বের হয়ে সারা দুনিয়ায় ছেয়ে গেল। এ স্বপ্ন তিনি হযরত আবদুল মুত্তালিবকে শুনালেন। পরে যখন হযরত আমেনাকে আল্লাহ্‌তা'লা চাঁদের মত একটি ছেলে দিলেন তখন হযরত আমেনা হযরত আবদুল মুত্তালিবকে ডেকে পাঠালেন এবং এ চাঁদকে তাঁর কোলে দিয়ে দিলেন। তিনি অনেক খুশী হলেন। ঐদিন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌র কথা তাঁর অনেক মনে পড়ল। পরে তিনি শোকরিয়া আদায় করার জন্যে খানা-এ-কা'বা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করলেন। খানা-এ-কা'বা তো খোদাতা'লার ঘর, তাই না? আর তাওয়াফ বলে উহার চতুর্দিক পাঁক ঘুরে আসাকে। হযরত আবদুল মুত্তালিব তাঁর এ ছোট্ট নাতিটাকে নিয়ে কা'বার তাওয়াফ করলেন এবং খোদাতা'লার শোকরিয়া আদায় করলেন। এভাবে একদিনের শিশুও খোদার ঘর তাওয়াফ করলেন।

শিশু—খান-এ-কা'বাতে কি সবার যাওয়ার অনুমতি ছিল?

মা—হযরত আবদুল মুত্তালিব মক্কার কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর পরদাদার নাম ছিল হাশিম। এজন্যে তাঁর গোত্রকে বনু হাশেম অর্থাৎ হাশেমের বংশধর বলা হতো। এ গোত্র খানা-এ-কা'বার রক্ষক এবং সর্দার ছিলেন। এজন্যে খানা-এ-কা'বার তাওয়াফ করার জন্যে তাঁর কারও অনুমতির প্রয়োজন ছিল না।

শিশু—এ প্রিয় শিশুটির নাম কে রেখেছিলেন?

মা—হযরত আমেনা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শিশুর নাম রাখা হবে আহ্‌মদ। আহমদ শব্দের অর্থ হলো—সর্বাধিক প্রশংসাকারী। তাঁর (সাঃ) দাদা নাম রাখলেন 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ সর্বাধিক প্রশংসিত। আর এই নামই সকলে পসন্দ করলেন। তাঁর (সাঃ) জন্মের পূর্বে খোদা তাঁর প্রিয় নবীগণকে বলেছিলেন যে, অতীব মর্যাদাবান একজন নবী-(সাঃ) জন্ম গ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ (সাঃ)। পুরোনো গ্রন্থাদিতেও আগমনকারী নবীর নাম 'মুহাম্মাদীম' লিখিত ছিল যার অর্থ হলো আমার মুহাম্মাদ।

শিশু—তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো—আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং রেখেছেন।

মা—অবশ্যই ঠিক বলেছো। খোদার ইহাই ইচ্ছে ছিল যেন তাঁর নাম মুহাম্মদ রাখা হয়। ঐ শিশুর জন্ম হওয়ার কারণে সব চাচারাই খুশী হলেন। তাঁর চাচা আবু লাহাবকে যখন তার দাসী বল্লো যে, আপনার ভাই আবদুল্লাহ্‌কে খোদাতা'লা একটি পুত্র সন্তান দিয়েছেন। তখন সে খুশী হয়ে ঐ দাসী সাওবিয়াকে মুক্ত করে দিলো।

শিশু—ধাত্রী হালিমা সম্পর্কিত কথাও তো বলুন।

মা—ঐ যুগে আরবের লোকেরা তাদের ছোট মনিদেরকে শহর থেকে গ্রামের খোলা-মেলা পরিবেশে পাঠিয়ে দিতেন যেন তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় আর তারা উত্তম প্রাঞ্জল ভাষা শিখে।

শিশু—উত্তম ভাষা বলতে কি বুঝায় ?

মা—শহরে তো বাইরের থেকে লোক জন আসতে থাকে। তারা নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে। তাই তাদের ভাষা মিশ্র ও বিচিত্র হয়ে থাকে (যেমন, ঢাকায় নানা ভাষাভাষী লোক বাস করে। এখানে বাংলা ভাষাও বহুভাবে বলা হয়—যেমন ঢাকাইয়া, নোয়াখালী, সিলেটী প্রভৃতি লোকেরা মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে—অনুবাদক)। কিন্তু (আরবের) গ্রামে কেবল আরবী ভাষায়ই কথা বলা হতো। শিশুরা ঐ ভাষাই শিখত যা তারা তাদের বড়দের বলতে শুনত।

শিশু—ধাত্রী হালিমা সম্পর্কে বলুন না।

মা—ঘটনা এরূপ যে, মক্কায় মহিলারা আসত যেন তারা শিশুদেরকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন কোন মহিলা ইহা জানতে পারতো যে, এ শিশুর আব্বু নেই তখন সে চিন্তা করতো যে, এ এতীম শিশু লালন-পালন করলে কী পাওয়া যাবে ? একে ছেড়ে দাও, অন্য কোন ধনীর দুলালকে নিয়ে নাও। ঐদিকে ধাত্রী হালিমা কোন শিশু পাচ্ছিলেন না, কেননা তিনি গরীব। তার উটনীটিও দুর্বল ছিল। আস্তে আস্তে চলছিল। ধনীরা মনে করলো যে, তাকে শিশু দিলে তিনি খাওয়াবেন কী ? যখন সব মহিলারা শিশু পেয়ে গেল তখন কেবল ধাত্রী হালিমাই শিশু পেলেন না। আর এদিকে আমিনার চাঁদের টুকরোও রয়ে গেল। ধাত্রী হালিমা মনে মনে ভাবলেন, যখন মক্কায় আসতেছিলাম তখন সব মহিলারাই ঠাট্টা মস্করা করছিল এ নিয়ে যে, হালিমার উটনী চলতেই পারে না! আর এখন খালি হাতে ফিরে গেলে তারা আমাকে আরও ঠাট্টা করবে। এ কথা মনে করে তিনি এ আদরের শিশুকেই নিয়ে নিলেন এবং তার সঙ্গীদের সাথে গ্রামের পথে রওয়ানা দিলেন।

শিশু—দুর্বল উটনীতো তখন মোটেও চলতে পারছিল না, তাই না আম্মু।

মা—না, আব্বু। উটনীটি তখন সবার আগে আগে যাচ্ছিল। কারণ তার পিঠে সেই শিশুটি বসা ছিল, যে ভবিষ্যতের সকলকে সর্বযুগে পথ দেখাবে বলে নির্ধারিত ছিল। খোদাতা'লা সেই উটনীটিকে শক্তি দিলেন আর সে সবার আগে আগে চলতে লাগল। উটনীটি অনেক বেশী দুধ দিতে লাগলো যাতে শিশুটি পেট পুরে দুধ পান করতে পারে। যখন হযরত হালিমা বাড়ী পৌঁছলেন তখন দেখতে দেখতে তাঁর বাড়ীর চেহারাই বদলে গেল। বকরীগুলো বেশী বেশী দুধ দিতে লাগলো। ক্ষেত শস্যে ভরপুর হয়ে উঠলো। অন্যান্য শিশুরাও মোটা তাজা হয়ে উঠলো।

শিশু—যেসব মহিলা হালিমাকে ঠাট্টা মস্করা করতো তখন তো তারা খুবই হিংসায় জ্বলছিল, তাই না আম্মু।

মা—ইহা জানা নেই, তবে সবার ইহা জানা হয়ে গেল যে, বনী হাশেমের এ শিশু কোন সাধারণ শিশু নয়। এঁর সাথে খোদার কল্যাণ এসেছে। এ শিশু প্রথম থেকেই বড় সাহসী ও আদরের ছিল।

শিশু—তার সাহসীকতা কীভাবে জানা গেল ?

মা—একটি ঘটনা শুন। এক বার শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তার দুধ-ভাই-বোনদের সাথে বকরী চড়াচ্ছিলেন। কতিপয় ডাকাত এসে তাড়াতাড়ি করে বকরী-গুলোকে একত্র করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। এ ছোট্ট আদরের শিশুটি ডাকাতদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন আর বললেন, "আমি এ বকরীগুলো নিয়ে যেতে দেব না"। ডাকাতরা তাদের সর্দারকে এ কথা জানাল। সর্দার আসল। তিনি সর্দারকেও বল্লেন, "এ বকরীগুলো নিয়ে যেতে দেব না।" সর্দার ঐ সাহসী শিশুকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে আসল আর তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কি ?" ছোট্ট শিশু সাথে সাথেই সাহসের সাথে জবাব দিলেন, "মুহাম্মদ"। সর্দার বললো, "খুব ভাল নাম তো। তোমার আব্বুর নাম কি ?" ছোট্ট সাহসী শিশু তাঁর দাদার নাম বললেন, "আব্দুল মুত্তালিব।" সর্দার বল্লো, "আসলে কুরায়েশ সর্দারের পুত্র এরূপই হওয়া উচিত।" এভাবে এই নির্ভীক শিশু তাঁর ছোট্ট ছোট্ট হাত বাড়িয়ে নিজেদের বকরীগুলোকে বাঁচিয়ে নিলেন আর ডাকাতরা ফিরে গেল।

শিশু—আরও একটি গল্প বলুন না, আম্মু ?

মা—বাকী ঘটনা আমি রাত্রে বলবো, আব্বু।

শিশু—আপনি ভাল ভাল গল্প এবং ভাল ভাল কথা রাত্রে বলেন কেন, আম্মু ?

মা—এজন্যে যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন রাত্রে নামাযের পরে শোয়ার জন্যে বিছানায় যেতেন তখন কতকগুলো দোয়া পাঠ করতেন আর তাঁর খোদাকে স্মরণ করতে করতে ঘুমিয়ে যেতেন। আমিও চেষ্টা করছি যে, যখন আমি আর আমার সোনামনি রাত্রে শুতে যাব তখন পবিত্র লোকদের পবিত্র কথা-বার্তা বলতে বলতে ঘুমিয়ে যাব। (চলবে)

(৩৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তাহলে আমাদের দেশে কোন জায়গা এমন অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে খোদা এবং তাঁর রসূল (সাঃ)-এর কথা হতে থাকবে না, যেখানে কুরআনের শিক্ষা দেয়া হবে না এবং যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছাবে না।" (খুতবা : আল ফযল : ১০ই মার্চ, ১৯৫৮ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর উপরোক্ত মহান পরিকল্পনা থেকে আমরা তাহরীকে ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারি। হুযুর (রাঃ) যে কর্মসূচী দান করেছেন সে প্রেক্ষিতে আমরা এখনও এর সামান্য অংশই পুরো করতে সক্ষম হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের দায়িত্ব অপরিসীম। ওয়াকফে জাদীদের বছরের অর্ধেকের বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে, সুতরাং আসুন আমরা এ খাতে সঠিকভাবে ওয়াদা করি এবং সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই (অর্থাৎ ৩১-১২-৯৪ তারিখের মধ্যে) নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করে দিয়ে আমাদের দায়িত্বের সামান্য টুকু হলেও পালন করি।

তাসাদ্দক হোসেন
সেক্রেটারী, ওয়াকফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

সংবাদ

মহান সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর জলসা

গত ২১শে আগষ্ট রোজ শনিবার দেশের বিভিন্ন জামা'তে অতি শান-শওকত ও মর্যাদার সাথে এবং ভাব-গম্ভীর পরিবেশে মহান সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব জলসায় বিশ্বনবী আমাদের প্রিয় নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। জলসা শেষে মিষ্টি দ্রব্য দ্বারা মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। কোথাও কোথাও আলোক সজ্জাও করা হয়।

এ পর্যন্ত যেসব জামাত থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তারা হলেন ঢাকা, কটিয়াদি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাহেরচর, ক্রোড়া, নাথালপাড়া হালকা, লাজনা ইমাইল্লাহ্—ঢাকা, দুর্গারামপুর, কুমিল্লা, ঘাটুরা, ভাতগাঁও ও বীরগঞ্জ জামা'ত। খবর এখনও আসছে।

আহমদী বার্তা

০ ১২/৮/৯২ইং রোজ শুক্রবার জুমুআর নামাযের পরে ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক বৃক্ষরোপণ অভিযান পালন করা হয়।

শুভ বিবাহ

গত ১৫/৪/৯৪ইং তারিখ বি, বাড়ীয়া, মোড়াইল নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের-এর তৃতীয় ছেলে জনাব ওসমান গনির সহিত ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা দেন মোহরানায় বি, বাড়ীয়া কান্দিপাড়াস্থ জনাব কাহার উদ্দিন আবু শামার দ্বিতীয় মেয়ে খালেদা আক্তার রুনার শুভ বিবাহ বি, বাড়িয়াস্থ মসজিদে সু-সম্পন্ন হয় আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত বিবাহের এলান করেন মৌলবী মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। উক্ত বিবাহ যাতে আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে বা-বরকত হয় সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার দরখাস্ত করছি।

আবুল হোসেন ভূঁইয়া

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সরিষাবাড়ীর একজন নব দীক্ষিত আহমদী জনাব মোঃ আঃ সালাম (খোকা মণ্ডল) গত ১২ই আগষ্ট রোজ শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় হার্ট ষ্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে.....রাজিউন)। তাঁর রুহের মাগফেরাত এবং পরিবারের সবার ধৈর্য ধারণের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সরিষাবাড়ী

আস্‌হাবে কাহাফের পাতা

আবু রকীব

পাকিস্তানে ব্লাসফেমীর শিকার

পাকিস্তানে ব্লাসফেমী আইন চালু হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কাউকেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় নি। তাহলে ??? সরকার আইনের মাধ্যমে বিচার করে তথাকথিত ধর্ম-নিন্দুক বা মুরতাদদেরকে শাস্তি দেবার আগেই মোল্লাদের নির্দেশে তথকথিত মুরতাদদেরকে হত্যা করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ বহু আহমদীকে হত্যা করা হয়েছে। ঐসব আহমদীদের কয়েকজনের ছবি নিম্নে ছাপা হল।

যারা এইসব নিরপরাধ আহমদীকে হত্যা করেছে তাদের আজ পর্যন্ত কোন বিচার হয়নি। কারণ মোল্লারা ফতোয়া দিয়েছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মুরতাদ বা ধর্ম-নিন্দুককে হত্যা করে তাহলে তার কোন বিচার হবে না।

বাংলাদেশে ব্লাসফেমী আইন চালু হলেও এইভাবে হত্যাকাণ্ড হতে থাকবে।

বিচিত্র সংক্ষিপ্ত সংবাদ ও মতামত

'একদল লোক গাদ্দারি করে পাকিস্তান ভেঙ্গেছে'—ওবায়দুল হক (ভো, কা, ৩০/৭/৯৪)

০ অর্থাৎ—যারা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে তারা গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক। আর যারা পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছিল এবং এখনও চায় তারাই হল দেশপ্রেমিক।

'যারা মৌলবাদী নয়, তারা জারজ মুসলমান'—চর মোনাইয়ের পীর (ভো, কা, ৩০/৭/৯৪)।

০ অর্থাৎ—'পে' অক্ষরটি আরবীতে না থাকা সত্ত্বেও পীর সাহেবরা বৈধ মুসলমান। আর যদি মূল ইসলাম বা আরবীতে 'পীর' শব্দটি না থেকে থাকে তাহলেও কি জারজ মুসলমান?

'ইসলামের নামে হরতাল লং মার্চ জুলুম'—মাওলানা আহমদ উল্লাহ আশরাফ (জনকণ্ঠ, ৪/৮/৯৪)।

০ দেখা যাক এর উত্তরে 'জালেমরা' কি বলে।

ব্লাসফেমী এবং মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়—এ ব্যাপারে কাদিয়ানীরা দলিল প্রমাণ প্রচার করছে (ইনকিলাব, ২৯/৭/৯৪)।

০ আপনারা দলীল প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করুন।

জাতীয় হিন্দু সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ অধ্যাপক গোলাম আযমকে অভিনন্দন জানায় (বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৩/৭/৯৪)।

০ কারণ হয়ত এই যে, ১৯৭১ সালে এদেরকে গোলাম আযমের লোকেরা হত্যা করেনি।

'সংসদে যারা আছে তারা কেউ মুসলমান নয়'—লং মার্চ সমাবেশে ঘোষণা (আ, কা, ৩০/৭/৯৪)।

০ এই 'অমুসলমান'দের কাছে দাবী ওরা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করুক এবং ইসলামী আইন চালু করুক।

'আমেরিকাই দাজ্জাল'—ইমাম সিরাজ ওয়াহাজ (ইনকিলাব, ২৬/৭/৯৪)।

০ দাজ্জাল তো এসে গেছে। এখন মসীহ কোথায়?

'আর দোয়ার রাজনীতি নয়, এবার বঙ্গভবনে বসতে চাই'—ফজলুল হক আমিনী (জনকণ্ঠ, ২৮/৬/৯৪)।

০ দোয়া যখন কবুলই হয় না তখন এ ছাড়া আর গতি কি!

খৃষ্টানদের অনুসরণে যদি ৩০০ মদের দোকান, পতিতাবৃত্তি এবং জুয়ার লাইসেন্স দেওয়া হয় তাহলে খৃষ্টানদের অনুকরণে ব্লাসফেমী আইন হবে না কেন?—জনৈক লেখক (সংগ্রাম, ১০/৮/৯৪)।

০ সাবাস! বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

মৌলানা আহমদ উল্লাহ আশরাফ বলেছেন, মৌঃ ফজলুল হক আমিনী বাবরি মসজিদের জন্য লং মার্চ করেন অথচ তিনিই আমার পিতার নামে মসজিদটির দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেছেন।

০ ঐটি বাবরি মসজিদ আর এটি বাবারই মসজিদ।

সম্পাদকীয় ঃ

মহানবীর (সাঃ) মহান আদর্শ

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন। সকল সৃষ্টির জন্য রহমত বা কল্যাণ-স্বরূপ। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর, ক্ষমার মূর্তিমান রূপ। তাঁর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম ইসলাম প্রকৃতিসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত জীবন বিধান। এই ধর্ম শান্তির ধর্ম।

ইসলাম বলে, ওয়া কুলিল হাক্কু মির রাব্বিকুম ফামান শায়া ফাল ইউমিন ওয়ামান শায়া ফাল ইয়াকফুর—অর্থাৎ, এই সত্য ধর্ম বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত, যার ইচ্ছা হয় এই ধর্মকে গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করবে। কেননা, লা-ইকরাহা ফিদ্দীন—ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। ফাবুহুমা শিতুম মিন হুনিহী, অর্থাৎ যদি কেউ চায় তাহলে সত্য খোদাকে বাদ দিয়ে তার ইচ্ছামত অন্য কাউকে পূজা করতে পারে। মহানবীকে (সাঃ) ধর্ম রক্ষার জন্য দারোগা করে পাঠান হয়নি। লাসতা আলাইহিম বিমুসায়তির। পবিত্র কুরআন বলে, ওয়ামাই ইয়ারতাদমিনকুম—তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ইসলাম ত্যাগ করে বা মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে উলাইকা আসহাবুন্নার—অর্থাৎ সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জাগতিক কোন শাস্তি নয়, মুরতাদের শাস্তি জাহান্নাম। মুরতাদ হওয়ার কারণে মহানবী (সাঃ) কাউকেই শাস্তি দেননি। কারণ মুরতাদ হয়ে যাবার পর পুনরায় সে ইসলামে ফিরে আসতে পারে। সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু। মহানবীর (সাঃ) এক ওহী লেখক মুরতাদ হয়ে গিয়ে ছিল। মক্কা বিজয়ের পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে এই ব্যক্তি ওমর (রাঃ) ও উসমানের (রাঃ) খিলাফত-কালে উচ্চ পদ লাভ করে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

ধর্ম-নিন্দা ও রসূল-নিন্দার কারণেও কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। এক ব্যক্তি মহানবীকে (সাঃ) মোজাম্মম বলত। উত্তরে রসূলে করীম (সাঃ) বলতেন, "মুহাম্মদ বা প্রশংসিত কখনও মোজাম্মম বা নিন্দিত হতে পারে না"। ইহুদীরা তাঁকে সালামের পরিবর্তে 'আস্‌সাম আলাইকা' বলত। এর অর্থ তোমার মৃত্যু হোক। কিন্তু এজন্য কোন শাস্তি দেয়া হয়নি।

নবী সহধর্মিণী আয়শা (রাঃ) ও মারিয়ার (রাঃ) চরিত্রে জঘন্য অপবাদ দেয়া হয়েছে। তবুও নবী করীম (সাঃ) অপবাদকারীদেরকে কখনও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন নি। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল মহানবীকে (সাঃ) মদিনার নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলেছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাকে শাস্তিতো দিলেনই না বরং নিজের কাপড় দিয়ে তার কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়লেন। খায়বারে নবী আকরামকে (সাঃ) যে ইহুদী রমণী বিষ দিয়েছিল তিনি তাকেও ক্ষমা করে দেন। ঘোষণা করেন, নারী হত্যা নিষিদ্ধ (বোখারী)। এক ব্যক্তি তাঁকে একা পেয়ে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। এক বুড়ি তাঁর রাস্তায় কাঁটা দিত। সেই বুড়ি যখন অসুস্থ তখন তিনি তাকে দেখতে যান। এক ব্যক্তি মদিনার মসজিদে প্রস্রাব করছিল। সাহাবীরা ধর মার বলে এগিয়ে গেলেন। মহানবী (সাঃ) ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে বল্লেন, "থাম, থাম, ওকে প্রস্রাব করতে দাও। হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হলে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।" তাঁর ঘরে রাতে এক ব্যক্তি বিছানায় মল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। সে তার তরবারিটি ফেলে গিয়েছিল, তাই এটি নিতে এসে দেখে বিশ্বনবী (সাঃ) তার মল পরিষ্কার করছেন।

এক বুড়ি তার মাল-পত্র নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। মহানবী (সাঃ) দেখলেন, বৃদ্ধা মহিলাটি তার মাল-পত্র ঠিকমত বহন করতে পারছে না। তিনি এগিয়ে এসে বল্লেন,

(অবশিষ্টাংশ সূচীপত্রের পাতায় দেখুন)

31st August, 1994 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ. কে. মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ. টি. চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury